ফেরা

পৃথিবীতে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চৌদ্দশত বছর আগে হয়ে থাকলেও, এর বার্তা সমসাময়িক কাল, পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতেও মানবজাতির জন্য সমানভাবে ফলপ্রসু। মানবসৃষ্ট বিভিন্ন ধর্মসমূহ সেকেলে হয়ে পড়লেও, ইসলামের বাণী বর্তমান সময়েও সকল দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সম্পূর্ণরূপে আধুনিক এবং প্রাত্যহিক জীবনব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলামের বার্তাসমূহ সমসাময়িক কাল, পরিস্থিতি এবং বাস্তবতায়ও মানবজাতিকে কিভাবে আলোর পথে, শান্তির পথে এবং কল্যানের পথে ধাবিত করতে পারে সেসব বিষয়ে গভেষনামূলক কিছু কাজ চিন্তাশীল পাঠকদের নিকট তুলে ধরতেই সমকালীন প্রকাশনের পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন
www.somokalin.com

ফেরা

ফেরা

সিহিন্তা শরীফা

নাইলাহ আমাতুল্লাহ

সম্পাদনা:

শরীফ আবু হায়াত অপু

শরঈ সম্পাদনা:

সানাউল্লাহ নজির আহমদ

সমকালীন প্রকাশন

মুখ খোলা

তারস্বরে চিৎকার করছে শিশুটা। বয়স বছর-দুই। অডিও মিটার দিয়ে মাপলে শব্দের মাত্রা পাওয়া যাবে ১০০ ডেসিবেলেরও বেশি। 'না, না কাঁদে না'—কাজ করছে না। কোল বদলেও অবস্থা বদলালো না। শেষে একটা মুখ বলে উঠল, 'সেদিন রাস্তার ওই সাদা বেড়ালটা কী করেছিল জানো?'

বন্ধ চোখজোড়া খুলে গেল। অডিও মিটারের কাটাটা সাঁই করে ঘুরে বাম দিকে চলে এলো শূন্যের কোলে। গাল বেয়ে পড়া অশ্রুধারা ছাড়া আর কোনো প্রমাণ রইল না অতীত বেদনার। কান খাড়া হয়ে মুখ বন্ধ হয়ে গেল। শিশুটা জানতে চায় সাদা বেড়ালটা কী করেছিল।

মানুষ গল্প শুনতে ভালোবাসে। শিশুরা। বড়রা।

কিছু গল্প অলীক। কল্পনার জগতে তার জন্ম। পাঠককে অবাস্তব কিংবা পরাবাস্তব অভিজ্ঞতা দেয় সেসব গল্প। বাস্তব থেকে লেখকের কল্পনার জগতে বিবেক বদলি হয়।

কিছু গল্প সত্যি। সত্য ঘটনাকে গুছিয়ে বলা হয় তাতে। শহুরে মানুষের কৃত্রিম কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে আনা হয়। আসল বাস্তবতা।

এ বইটাতে আমরা দুটো গল্প শুনব। দুই বোনের গল্প। তাদের ফিরে আসার গল্প। সত্যি গল্প।

আশা করি গল্পদুটো পড়ে আনন্দের পাশাপাশি আমরা কিছু ভাবনার খোরাক পাব।

- সমকালীন প্রকাশন

‘আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ ...’

‘সাউন্ড বন্ধ করো! সাউন্ড বন্ধ করো! তোমরা কেউ সাউন্ড কমিয়ে দিচ্ছ না কেন?’

বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। ঈদের দিন বাবা-মায়ের সাথে বেড়াতে এসেছি দাদির বাড়ি। দেশের একমাত্র টিভি চ্যানেল বিটিভি তে তখন প্রতিদিন পাঁচবার করে আযান শোনা যেত। সব সময় দেখে এসেছি আমাদের বাসায় আযানের সময়টুকু সাউন্ড মিউট করে রাখা হয়। তাই দাদির বাড়িতে সবাই চুপচাপ টিভিতে আযান শুনছে দেখে এভাবেই চিৎকার করে উঠলাম আমি। এতগুলো মানুষের সামনে আমার অপ্রস্তুত বাবা-মা সেদিন পরিস্থিতি কেমন করে সামাল দিয়েছিলেন মনে নেই—তবে সেদিনের পর থেকে এটা বুঝে গিয়েছিলাম যে ওরা আর আমরা এক নই। ওরা মুসলিম, আমরা খ্রিস্টান।

ঈদের দিন আমাদের কাউকে নতুন জামা কিনে দেওয়া হতো না; অথচ বড়দিন, নতুন বছরের প্রথম দিন অথবা ইস্টার সানডে তে নতুন জামা পরলেও দাদির বাড়ি যাওয়া হতো না। কারণ একটাই। আমরা খ্রিস্টান, ওরা মুসলিম।

বাবা, মা আর দুই বোন নিয়ে একটি সুখী পরিবার ছিল আমার। ছোট ভাইয়ের জন্ম হয়নি তখনও। আমরা নানার বাড়ির অদূরে একটি ভাড়া বাড়িতে ছিলাম। মায়ের দিকের প্রায় সব আত্মীয়-স্বজন কাছাকাছি থাকতেন খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকাটিতে। জন্মের পর থেকেই জেনে এসেছি আমি একজন খ্রিস্টান, রোমান ক্যাথলিক। বাবা-মা যে খুব বেশি ধর্মপরায়ণ ছিলেন তা না। তবে তারা নিজেদের খ্রিস্টান বলেই দাবি করতেন।

সারাজীবনে দাদাকে দেখেছি হাতে গোনা কয়েকবার। ঈদের দিন মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন বাবা। দাদার পরিবার খ্রিস্টান না, এটা জানার আর বোঝার পর আমার প্রতিক্রিয়া কী ছিল মনে নেই। ছোট ছিলাম বলেই হয়তো ওই সময়ে অত কিছু আর

ভাবা হয়নি ওই ব্যাপারে। আসলে তাদের নিয়ে ছেলেবেলার তেমন কোনো স্মৃতি মনে পড়ে না আমার।

শুনেছিলাম বাবা নাকি আমার মাকে ভালোবেসে মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও খ্রিস্টান হয়েছিলেন, যেন মাকে বিয়ে করতে পারেন। যদিও বাপ-দাদার ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি খানিকটা হলেও শ্রদ্ধা ছিল তার। কখনো কখনো নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। সে সময় তিনি একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যার কাছে ইসলামধর্মের প্রশংসা শুনতাম। মুসলিম পরিবারে জন্ম বলেই হয়তো ওই ধর্মকে ভালো মনে করতেন। কখনো দেখিনি তাকে ধর্মীয় উৎসব ছাড়া খ্রিস্টধর্ম বা অন্য কোনো ধর্মের আর কিছু পালন করতে। অনেক আগে একবার আমাদের সাথে গির্জায় নিয়ে গেলেন মা। মিসায় কী কী বলতে হয় কিছুই পারলেন না বাবা। বেশ মজা পেলাম তখন। আমি যা পারি বাবা তা পারেন না।

ছেলেবেলা থেকে আমার কাছের বন্ধুরা সবাই ছিল হিন্দু নয়তো খ্রিস্টান। আমার পরিবারের লোকজনেরও খ্রিস্টান কমিউনিটির বাইরে খুব একটা মেলামেশা ছিল না। আর তাই সত্যিকার মুসলিমদের জীবনধারা সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণাই ছিল না তখন। তাদের সম্পর্কে সব সময় একটা খারাপ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠছিলাম। শিক্ষাক্ষেত্রে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে, ছোটখাটো অথচ বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার কারণে ধীরে ধীরে ধর্ম সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা বদলে গিয়েছিল। শৈশবেই ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সাথে জন্ম নিয়েছিল খ্রিস্টধর্মের প্রতি ভালোবাসা।

আমাকে নিয়ে বাবা-মা একবার মায়ের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। তখন আমি খুবই ছোট। বাবা ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান—এ খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন নাকি তাকে মারতে চলে এসেছিল। জান নিয়ে কোনোরকমে পালিয়ে এসেছিলেন তারা। এরপর আর কখনো গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি আমার। তবে বড় হয়ে যখন এই ঘটনা শুনলাম, তখন এর সারমর্ম আমার কাছে এই ছিল যে মুসলিমরা খুব খারাপ। আমার বাবাকে মারতে চেয়েছিল এরা, অথচ এদের তো কোনো ক্ষতি করেননি তিনি। শুধু তাদের ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে বলে একটা মানুষকে মারবে?

বয়স তখন ছয় বছর আমার, ভাইটা প্রিমাচিওর্ড হওয়াতে মাকে বেশ কয়েকদিন থাকতে হলো হাসপাতালে। আমাকে নানির বাসায় আর ছোট বোনকে দাদির বাসায় রেখে বাবা অন্য কাজে ব্যস্ত। পরে বাসায় ফেরার পর শুনি আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট বোনটা দাদির সাথে সলাত পড়া শিখে ফেলেছে। সবাই হেসেই উড়িয়ে দিল ব্যাপারটা। আমিও মজা পেলাম। ওর কাছ থেকে দেখে নিলাম কীভাবে পড়েছিল ও। ব্যায়ামের মতো করে উঠা-বসা করতে হয়, আর আল্লাহ আল্লাহ বলতে হয়। অদ্ভুত লাগল, আমাদের ধর্মে তো এ ধরনের কিছু করতে হয় না। সেই প্রথম আমি মুসলিমদের সলাত সম্পর্কে ধারণা লাভ করলাম।

ছোট ভাইয়ের জন্মের আগে আমাদের বাসা পরিবর্তন করা হয়েছিল। একই এলাকায়। বাসাটা ছিল নীচতলাতে। একদিন বারান্দায় বসে খেলছিলাম আমি। বড়রা কেউ ছিল না আশেপাশে। আপাদমস্তক কালো জামা পরা কে যেন এসে দাঁড়ালেন বারান্দার ওপাশে। হাত তুলে ডাকলেন আমাকে। ভয়ে চিৎকার করে দৌড়ে পালালাম। আমার দেখা প্রথম হিজাবি মহিলা। হয়তো কালো বোরখা পরা কোনো এক প্রতিবেশিনী এসেছিলেন নতুন ভাড়াটেদের সাথে পরিচিত হতে।

মাসজিদে আযান শোনা গেলে আমিও আযান দেওয়া লোকটার সাথে সাথে গাইতাম। মা ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিতেন কেন বুঝতাম না। শুনেছিলাম মা নাকি ছোটবেলায় আযান শুনে ভয় পেতেন।

ছেলেবেলায় পরিবার, স্কুল আর বিভিন্ন বইপত্র থেকে এই শিক্ষা পেয়েছিলাম যে মুসলিমরা খারাপ আর আমরা ভালো। টিভি-পত্রিকার অপরাধবিষয়ক খবরগুলো দেখিয়ে বলা হতো যত সব অন্যায় কাজ মুসলিমরাই করে। কখনো শুনেছ আমাদের খ্রিষ্টান কোনো ছেলে চুরি করেছে বা সন্ত্রাসী হয়েছে? ধর্ম ক্লাসে ওদের বিরুদ্ধে প্রায়ই শুনতে হতো। ওরা হলো ক্ষতিকর লাল পিপড়া আর আমরা নিরীহ কালো পিঁপড়া।

ক্যাথলিক চার্চকে এদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলী বলা হয়। মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে সাতটা sacrament নির্দিষ্ট বয়সে, নির্দিষ্ট সময়ে পালন করতে হয়। প্রথমটা হলো

baptism (দীক্ষাস্নান), যা দ্বারা একটি শিশুকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা হয়, অর্থাৎ তাকে খ্রিস্টান বানানো হয়। এদিনে তার নাম রাখা হয়; ধর্ম-বাবা, ধর্ম-মা নির্ধারণ হয়—যারা শিশুটির বাবা-মায়ের অবর্তমানে তার দেখাশোনা, ভরণ-পোষণ, ধর্মীয় শিক্ষা ইত্যাদির দায়িত্ব নিতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাস অনুসারে প্রত্যেক মানবশিশু আদমের যে 'আদিপাপ'[১] নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, দীক্ষাস্নান তার সেই পাপ মোচন করে। জন্মের একুশ দিন পর আমাকেও বেশ ঘটা করে baptised করা হলো। নাম রাখা হলো কর্নেলিয়া স্টেফানি ম্যান্ডেয।

একটু বড় হলে মা যখন ভর্তি করিয়ে দিলেন একটা খ্রিস্টান মিশনারি স্কুলে, সেখান থেকেই শিখতে লাগলাম ধর্মের যাবতীয় নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি। ক্যাথলিক রীতি অনুসারে এর পর এক এক করে বিভিন্ন বয়সে Confirmation, Eucharist আর Penance সম্পন্ন করলাম। প্রত্যেকটা স্যাক্রামেন্টের আগে কয়েক সপ্তাহ ধর্ম ক্লাসে যেতে হতো।

সে সময় রবিবারে নিয়মিত গির্জায় যেতাম, ভক্তির সাথে খেতাম ওয়াইনে ভেজানো রুটির টুকরো—ওয়াইন যিশুর রক্ত আর রুটি যিশুর মাংসকে প্রতিনিধিত্ব করে। চার্চের ফাদারের কাছে গিয়ে পর্দার আড়ালে হাঁটু গেড়ে 'পাপ-স্বীকার' করতাম নিয়মিত। ধর্ম ক্লাসে যেতাম, প্রচুর ধর্মের বই পড়তাম। প্রায় সব 'প্রার্থনা' মুখস্থ ছিল আমার। রাতে ঘুমানোর সময় ছোট বোনকে সাথে নিয়ে rosary মালা হাতে হাঁটু গেড়ে ঘণ্টাখানেক প্রার্থনা করতাম। বেচারি প্রার্থনারত অবস্থায় পুরোটা শেষ হওয়ার আগে ঘুমিয়ে পড়ত প্রায়ই।

বেশ কিছু ধর্মীয় বই সংগ্রহে ছিল আমার। সাধু-সাধ্বী আর প্রেরিত ভাববাদীদের কাহিনি—অ্যাডাম, নোয়াহ, আব্রাহাম, যোসেফ, ডেভিড, যোনা, মোশি আর যিশু। ছিল বাইবেলের একটি ইংরেজি ভার্শনের সাধু আর চলিত দুইটি ভিন্ন রীতির বাংলা

---

১ আদিপাপের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী প্রথম মানুষ আদম, আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে এক মহা পাপ করেছিলেন এবং তাঁর পাপের জন্য তাঁর সকল সন্তান জন্ম হয়েছে পাপী হয়ে। ইসলামের দৃষ্টিতে আদম আলাইহিস সালাম অনুতপ্ত হওয়ার পরে আল্লাহ তাঁকে একটি দুআ শিখিয়েছিলেন: 'হে রব, আমরা নিজেদের ওপরে অন্যায় করে ফেলেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, আমাদের ওপর করুণা না করেন, তাহলে তো আমরা সর্বহারাদের একজন হয়ে যাব। [আল-আ'রাফ, ৭:২৩] এই দুআ নিরন্তর করুণাময় আল্লাহ কবুল করেন এবং আদম আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করে দেন। [আল বাকারাহ, ২:৩৭] -সম্পাদক।

অনুবাদ। প্রায় প্রতিদিন পড়তাম সেগুলো, নোট করে করে। নিজেকে খ্রিস্টান হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতাম।

শৈশব-কৈশোরে বেশ ধর্মপরায়ণ ছিলাম আমি। বিশ্বাস করতাম, একসময় আমাদের পাপ-পুণ্যের হিসেব নেওয়া হবে। মনে-প্রাণে বিশ্বাস ছিল পুনরুত্থান দিবস, শেষ বিচার আর অনন্তজীবনে। বাবা-মায়ের অবাধ্য হওয়া চলবে না, তাদের কষ্ট দেওয়া যাবে না, মিথ্যা কথা বলা যাবে না—চেষ্টা করতাম ধর্মের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ সাধ্যমতো মেনে চলতে। ফলে, পরিচিত সবার কাছে 'ভালো' মেয়ে বলে সুনাম ছিল। সবাই আমাকে বিশ্বাস করত, ভালোবাসত।

খ্রিস্টবাদ আমার রক্তে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে কৈশোর পেরিয়েও আমি যেই ধর্ম মানছি সেটা সত্য নাকি মিথ্যা সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা মাথাতেই আসেনি। মানতে হবে বলেই মানা। সবাই তো সেই একজন সৃষ্টিকর্তাকেই ডাকে। তবে মাঝে মাঝে বিভ্রান্ত হয়ে যেতাম। মেলাতে পারতাম না কিছু প্রশ্নের উত্তর। আর সময়ের সাথে সাথে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই একটা সময়ে এসে বদলে গিয়েছিল আমার সম্পূর্ণ জীবনধারা।

আমাদের স্কুলটি ছিল মিশনারি একটি অরফানেজের[২] অংশ। অরফানেজের ভেতরে গাছপালা দিয়ে সুন্দর করে সাজানো স্নিগ্ধ-শান্ত পরিবেশ। স্কুলের সাধারণ ছাত্রীদের জন্য স্কুলের নির্ধারিত সীমানার বাইরে–অর্থাৎ অরফানেজের ভেতরে যাওয়া নিষেধ ছিল। প্রত্যেক বছর দুর্গাপূজার সময় একটা নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে তিন ধর্মের অনুসারীদের নিয়ে তিনটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হতো স্কুলে। হিন্দুরা পূজা দিত খেলার মাঠে অবস্থিত টিফিন-ঘরে। অডিটরিয়ামে হতো মুসলিমদের মিলাদ। আর খ্রিস্টান ছাত্রীদের সিস্টার (nun) এসে নিয়ে যেতেন চ্যাপেলে। চ্যাপেলটা হলো সেই নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যে। প্রার্থনার এই নির্দিষ্ট দিনটি ছাড়া আর কখনো যাওয়ার সুযোগ হয়নি সেখানে।

---

২ Orphanage - এতিমখানা

একবার এমনই এক দিনে চ্যাপেলের ভেতরে নিয়ে আমাদের ধ্যান করতে বসিয়ে দেওয়া হলো। সুনসান নীরবতা, হঠাৎ হঠাৎ মৃদু টুংটাং মিষ্টি একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূরে কোত্থেকে যেন পাখির কিচির মিচির ভেসে আসছে। শান্তি শান্তি একটা ভাব। আহ! কতই না সুন্দর আমার ধর্ম। চ্যাপেল থেকে বের হয়ে দেখি হিন্দুদের পূজা শেষ, প্রসাদ বিতরণ চলছে। ওরাও আমাদের মতো মূর্তিপূজা করে। আমরা যিশুর, কুমারী মারিয়ার আর বিভিন্ন সাধু (saint) ব্যক্তিদের কাছে প্রার্থনা করি, আর ওরা করে দেব-দেবীদের কাছে। দেখলাম, মেয়েগুলো সব সুন্দর করে সেজেগুজে এসেছে। হিন্দু বান্ধবীদের কাছ থেকে প্রসাদ খেলাম। কী মজা!

অডিটরিয়ামের দিকে গিয়ে দেখি পেটমোটা দাড়িওয়ালা হুজুর বের হচ্ছেন, সাথে শুটকো অ্যাসিট্যান্ট হুজুর। এদের দেখলেই ঘেন্না লাগে আমার। কী যে এসব মিলাদ টিলাদ হয় এদের। মুসলিম সহপাঠীরা দেখলাম বের হয়ে কেউ কেউ মাথা থেকে ওড়না ফেলে দিচ্ছে। কেউ কেউ শুনলাম নিজেরাই হুজুরের নামে বলত লাগল—কেমন করে তিনি মেয়েদের দিকে তাকান, কেমন করে কথা বলেন। শুনে এসব হুজুর টাইপ মুসলিমদের প্রতি ধারণা আরও খারাপ হয়ে গেল আমার। ঘৃণা আরও বেড়ে গেল।

খ্রিষ্টানদের বড়দিন বা খ্রিষ্টমাস ডে ছাড়াও আরেকটি ধর্মীয় উৎসব হলো ইস্টার সানডে বা যিশুর পুনরুত্থান দিবস। প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের ধারণা অনুসারে, যিশু খ্রিষ্টের মৃত্যুর পর তিনি পৃথিবীতে ফিরে এসে আবার চলে যাওয়ার দিনটি ইস্টার সানডে হিসেবে পালন করা হয়। ক্যাথলিকদের জন্য খ্রিষ্টমাসের চাইতেও বড় ধর্মীয় উৎসব এটি। ইস্টার সানডের আগে ছয় সপ্তাহ শুক্রবারের দিনগুলোতে কোনো ধরনের মাংস খাওয়া নিষেধ। এই দিনের আগের চল্লিশদিনকে লেন্ট (lent) বলা হয়। লেন্টের দিনগুলোতে বেশি বেশি প্রার্থনা, উপবাস, ভালো কাজ আর আত্মশুদ্ধির জন্য বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কাজকর্ম করা হয়। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যে দুই-একজন ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন, তাদেরকে দেখতাম উপবাস থাকতে, নিরামিষ খেতে—প্রত্যেক শুক্রবার, রবিবার আর ভস্মবুধবার (ash wednesday) চার্চে যেতে। রোমান ক্যাথলিকদের উপবাসের নিয়ম হলো শুক্রবারে যেকোনো ধরনের বিলাসদ্রব্য আর মুখরোচক খাবার থেকে বিরত থাকতে হবে। সারাদিনে একবার খেতে হবে দুই খাবারের মধ্যবর্তী সময়ে—যেমন সকালের আর দুপুরের খাবারের মাঝের একটা সময়ে। এ ছাড়া দিনে আরও দুইবার খাওয়া যাবে এমনভাবে যেন দুই সময়ের খাবার একসাথে করলে সাধারণভাবে একবারের খাবারের চেয়েও কম হয়। ব্যাপারটা যার যেভাবে ইচ্ছা সে সেভাবে পালন করত।

শুক্রবার দেরি করে ঘুম থেকে উঠে দুপুর বারোটা পর্যন্ত না খেয়ে থেকে মা-সহ আমরা দুই বোনও উপবাস থাকতাম নিয়মিত। বাবাকে কখনো দেখিনি আমাদের সাথে যোগ দিতে। সে সময়ে বাসায় নিরামিষ রান্না হতো শুধু শুক্রবারে। এছাড়া চার্চের আর কোনো কিছুতে অংশগ্রহণ করতে দেখতাম না মাকে। অর্থাৎ আমার পরিবারে ধর্ম-কর্ম যা করার আমরা দুই বোনই করতাম। ভস্মবুধবারে আর গুড ফ্রাইডেতে আমরা খালা অথবা মামিদের সাথে গির্জায় চলে যেতাম।

একবার ইস্টার সানডের আগে স্কুল বন্ধ ছিল, খুললেই পরীক্ষা শুরু। ভাবলাম এবার আমি কঠিন উপবাস পালন করব, শিথিল করা সহজ উপবাস না। মনে আছে পুরো চল্লিশটা দিন শুধু নিরামিষ খেয়ে থাকলাম। এমনকি ডাল অথবা একটা ডিম পর্যন্ত খাইনি, এগুলো আমিষ জাতীয় খাবার বলে। এত অল্প বয়সে এত ধর্মপরায়ণতা দেখে বড়রা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল।

তখন কিছু মুসলিম সহপাঠী আর প্রতিবেশীদের কল্যাণে মুসলিমদের রোযা সম্পর্কে সামান্য যে ধারণা ছিল তা হলো এরা এক মাস সকাল থেকে সারাদিন কিছুই না খেয়ে থাকে আর সন্ধ্যায় সব মজার মজার খাবার খায়। আমি মনে করতাম যে এই এক মাসে যেদিন ইচ্ছা রোযা রাখা যায়। এটা বাধ্যতামুলক কি না তাও জানা ছিল না।

প্রতি বছর নভেম্বরের দুই তারিখে মৃতলোকের পর্ব (all deaths day) পালন করে রোমান ক্যাথলিকরা। গির্জায় বিকাল থেকে প্রচুর লোক সমাগম হতে থাকে। রাতে দেখা যায় গির্জাঘরে, গির্জার বিশাল প্রাঙ্গণে আর তার একপাশে অবস্থিত কবরস্থানে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। কয়েক হাজার কবরে জ্বলতে থাকে অসংখ্য মোমবাতি। আমাদের নানার কবরে পরিবারের সবাই একটি করে মোম জ্বালতাম। মা বলতেন নানার কাছে প্রার্থনা করতে; কবরে নানার পা যেদিকে থাকার কথা, সেদিকে ছুঁয়ে সালাম করতে। খ্রিষ্টানদের এই পর্বের দিনটি চমৎকার মনে হতো। সহপাঠীদের আমাদের এই অনুষ্ঠানের কথা গর্বভরে বলতাম। খ্রিষ্টমাস ইভের রাতের মতো এই রাতেও অনেক বিধর্মী মোমের আলোয় জ্বলন্ত কবরস্তান দেখতে চলে আসত গির্জায়।

প্রথম দিকে সামান্য যা ধর্ম-কর্ম পালন করা হতো, জাগতিক ব্যস্ততার কারণে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তাও উঠে যাচ্ছিল আমার পরিবার থেকে। ধর্ম পালন শুধু পর্বের দিনগুলো পালন করার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছিল দিন দিন।

স্কুলে একদিন এক মুসলিম সহপাঠীর ধর্মশিক্ষা বই হাতে নিয়ে দেখছিলাম। বিস্ময়ের সাথে সেদিন আবিষ্কার করলাম ওদের ধর্মেও সেই সব ব্যক্তিদের কাহিনি রয়েছে যাদের কথা আমাদের বাইবেলে আছে। ওরা যাদের নবী বলে, আমাদের বাংলা বাইবেলে তাদের 'ভাববাদী' বলা হয়েছে। যোসেফের কাহিনি পড়লাম, ওদের বইয়ে যোসেফের নাম ইউসুফ। পড়লাম কেমন করে ইউসুফের ভাইয়েরা তাকে কুয়ার মাঝে ফেলে দিয়েছিল। হুবহু সেই কাহিনি যা আমি 'খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষা' বইতে পড়েছিলাম। পরে বাবা বললেন অ্যাডাম, আব্রাহাম, মোশির কাহিনি নাকি ইসলামেও আছে। ওদের ধর্মে তাদের নামের উচ্চারণ শুনে উদ্ভট আর ক্ষ্যাত লাগল। বাইবেলের নামের সাথে অভ্যস্ত ছিলাম বলেই হয়তো খ্রিষ্টধর্মের নামগুলো বেশি ভালো লাগতো। এ ছাড়া বাবার কাছে শুনেছিলাম ইসলামধর্মের সাথে আমাদের ধর্মের নাকি অনেক মিল রয়েছে। কী মিল রয়েছে আর পার্থক্যই বা কোথায়—তা নিয়ে আর আলোচনা হয়নি কখনো।

দশম শ্রেণিতে পড়ি তখন। ক্লাস শুরুর আগে অ্যাসেম্বলিতে আমাদের জানানো হলো স্কুলের কোনো এক প্রাক্তন শিক্ষক মারা গিয়েছেন। আমাদের জন্মেরও আগে কোনো একসময় তিনি এই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তার আত্মার৩ শান্তি কামনা করে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করানো হলো আমাদের দিয়ে। তিনি ঠিক কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন মনে নেই। শোক পালনের অংশ হিসেবে প্রথমে বাইবেলের কিছু অংশ পড়া হলো। আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে শুনলাম। আমাদের স্কুলটা মেয়েদের হলেও ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ছেলেরা পড়তে পারত। বাচ্চা একটা ছেলে, ক্লাস টু অথবা থ্রিতে পড়ে—কুরআন পড়তে শুরু করল। মজার ব্যাপার হলো—অন্য ধর্মগ্রন্থগুলো বই দেখে পড়া হলেও ছেলেটা কুরআন পড়ছিল, মুখস্থ—কিছুই না

---

৩ ইসলামের দৃষ্টিতে পরকালে দেহ এবং আত্মা উভয়ের ওপরেই শাস্তি অথবা শান্তি আপতিত হবে। 'আত্মার শান্তি' বা 'রুহের মাগফিরাত' কথাগুলো মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত একটি ভুল। -সম্পাদক।

দেখে। এর আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন পড়তে শুনেছি, দেখেছি। কখনো এভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মনযোগ সহকারে শোনা হয়নি। অনেক্ষণ ধরে আবৃত্তি করে গেল ছেলেটা। মিহি গলায় এত্ত সুন্দর সুর করে বলে যাচ্ছে, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম আমি। এত ছোট একটা ছেলে সম্পূর্ণ অন্য একটা ভাষায় লেখা গ্রন্থের এতখানি অংশ মুখস্থ করে ফেলেছে! মনে হচ্ছিল যেন শুনতে থাকি শুনতেই থাকি। আচমকা পড়া শেষ হতে আমার মনে হলো, ইশ, আরও কিছুক্ষণ যদি পড়ত! সুন্দর সুরেলা কোনো গান শুনলে যেমন অনুভূতি হয় আরকি। এরপর হিন্দুদের গীতা থেকে পড়া হয়েছিল। বাইবেলের মতোই বাংলায় দেখে দেখে অল্প কিছু অংশ। বাংলায় হলেও কী বলেছে না বলেছে কিছুই মাথায় ঢোকেনি তখন।

বড়দিনের আগে ডিসেম্বরের একদিন মা নানির বাসা থেকে ঘুরে এসে জানালেন বিকেলে ওই পাড়ার মাঠে প্রোজেক্টর দিয়ে ফিল্ম দেখানো হবে। যিশুর ফিল্ম। আমরা আনন্দে লাফালাফি শুরু করে দিলাম। বিকেলে মায়ের সাথে সবাই চলে গেলাম ফিল্ম দেখতে। সমস্ত মাঠ লোকে লোকারণ্য। শুরু হলো ফিল্ম। হা করে দেখছি সবাই। বাংলা ডাবিং ছাপিয়ে ভিনদেশি কী একটা ভাষা শোনা যাচ্ছে। বাইবেলে বর্ণিত যিশুর কাহিনি হুবহু দেখানো হচ্ছে। ধর্মের বইতে যা পড়েছি, গির্জায় গিয়ে যা শুনেছি—সব। কী যে ভালো লাগছিল! শেষের দিকে যিশুর মৃত্যুর দৃশ্য দেখানোর সময় মহিলারা কান্না ধরে রাখতে পারছিল না।

এরপর বড়দিনের দিন বিটিভিতে দেখানো হলো একই ফিল্ম। তবে বাংলায় ডাবিং করা হলেও কিছুক্ষণ দেখার পর মনে হলো কিছু কিছু শব্দ একটু কেমন যেন। আগেরবার যেটা দেখেছি সেটার মতো নয়। এরা খোদা[৪], ঈসা, দোয়া, আসমান ইত্যাদি ইসলামী শব্দ ব্যবহার করছে। বাইবেল থেকে বর্ণনা দেওয়ার সময় বাইবেলকে 'ইঞ্জিল' বলছে। আমাদের ধর্মের কাহিনী অথচ বলছে মুসলিমদের মতো করে। যিশুর জন্মদিন উপলক্ষে দেখানো খ্রিষ্টানদের বাইবেলের গল্প মুসলিম দর্শকদের উদ্দেশে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু কেন? তাদের কুরআনে কি যিশুর ঘটনা

---

৪ খোদা শব্দটাকে মুসলিমরা ব্যবহার করলেও কুরআন এবং সুন্নাহর কোথাও এ শব্দটির অস্তিত্ব নেই। ইংরেজি গড কিংবা বাংলা ঈশ্বর/ভগবান এর মতো খোদা শব্দটা ফারসি ভাষার একটি শব্দমাত্র। শব্দটির উৎস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যে খুদ অর্থাৎ নিজে থেকে এসেছে তাকে খুদা বা খোদা বলে। ইসলামী বিশ্বাসমতে আল্লাহর কোনো শুরু নেই, তিনি আল-আউয়াল। আল্লাহ সময়ের বাঁধনে বাধ্য নন বরং সব কিছুর মতো তিনি সময়কেও সৃষ্টি করেছেন। তাই কোনো একটি সময়ে তিনি ছিলেন না, তারপরে নিজে নিজে আসলেন, খুদা শব্দটির অর্থের এই দিকটিকে ইসলাম অস্বীকার করে। এজন্য মুসলিমদের উচিত আল্লাহ নিজে যে নামগুলো নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন, সেগুলো দিয়েই তাঁকে ডাকা। -সম্পাদক।

ঠিক এভাবেই আছে? বাবার কাছে শুনলাম তারা যিশুকে অন্যান্য নবীদের মতো সাধারণ একজন বার্তাবাহক নবী হিসেবেই মানে। তারা বিশ্বাস করে না তাঁর ক্রুশে মৃত্যু হয়েছে। তবুও কেন এভাবে দেখানো হলো? ওরা যেন নিজেদের বিশ্বাস ছেড়ে আমাদের যিশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে মেনে নেয়, সেজন্য? তাহলে তো ভালোই।

- আচ্ছা বাবা, বলো তো কোনটা ঠিক—ইসলাম না খ্রিষ্টধর্ম?

- বড় হয়ে নিজে পড়াশোনা করে জেনে নিয়ো।

মনের মাঝে গেঁথে নিয়েছিলাম কথাটা। কয়েকদিন ধরে মাথায় কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল যার উত্তর কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না আমি।

ঈশ্বর কেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন?

যখন কোনো কিছুই ছিল না, তখন কী ছিল?

মহাবিশ্ব শুরুর আগে কী ছিল? কেনই বা শুরু হলো?

ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছে?

কেন মানুষের জীবনে এত কষ্ট দেন ঈশ্বর?

কেন এতগুলো ধর্ম এই পৃথিবীতে?

উত্তরগুলো একদিন নিজে পড়াশোনা করে খুঁজে বের করতে হবে। কবে যে বড় হব!

একবার বাইবেলের গল্প নিয়ে লেখা একটি বই পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলাম শুরুতেই সৃষ্টির বর্ণনায় ভুল রয়েছে। লেখা আছে প্রথম দিনে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, আলো এবং দিন-রাত সৃষ্টি করলেন[৫]:

---

৫ আদিপুস্তক ১: ১-৫

শুরুতে, ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। প্রথমে পৃথিবী সম্পূর্ণ শূন্য ছিল; পৃথিবীতে কিছুই ছিল না। অন্ধকারে আবৃত ছিল জলরাশি আর ঈশ্বরের আত্মা সেই জলরাশির ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছিল। প্রথম দিন— আলো। তারপর ঈশ্বর বললেন, "আলো ফুটুক!" তখনই আলো ফুটতে শুরু করল। আলো দেখে ঈশ্বর বুঝলেন[৬], আলো ভালো। তখন ঈশ্বর অন্ধকার থেকে আলোকে পৃথক করলেন। ঈশ্বর আলোর নাম দিলেন, "দিন" এবং অন্ধকারের নাম দিলেন "রাত্রি"। সন্ধ্যা হলো এবং সেখানে সকাল হলো এই হলো প্রথম দিন।

চতুর্থ দিনে সৃষ্টি করলেন চাঁদ, সূর্য আর তারকারাজি৭:

তারপর ঈশ্বর বললেন, "আকাশে আলো ফুটুক; এই আলো দিন থেকে রাত্রিকে পৃথক করবে। এই আলোগুলো বিশেষ সভা শুরু করার বিশেষ বিশেষ সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আর দিন ও বছর বোঝাবার জন্য এই আলোগুলো ব্যবহৃত হবে। পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্য এই আলোগুলো আকাশে থাকবে।" এবং তা-ই হলো তখন ঈশ্বর দুটি মহাজ্যোতি বানালেন। ঈশ্বর বড়টি বানালেন দিনের বেলা রাজত্ব করার জন্য আর ছোটটি বানালেন রাত্রিবেলা রাজত্ব করার জন্য। ঈশ্বর তারকারাজিও সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীকে আলো দেওয়ার জন্য ঈশ্বর এই আলোগুলোকে আকাশে স্থাপন করলেন। দিন ও রাত্রিকে কর্তৃত্ব দেবার জন্য ঈশ্বর এই আলোগুলোকে আকাশে সাজালেন। এই আলোগুলো আলো আর অন্ধকারকে পৃথক করে দিল এবং ঈশ্বর দেখলেন ব্যবস্থাটা ভালো হয়েছে।

সূর্য যদি পরে সৃষ্ট হয়, তাহলে প্রথম দিনের আলো কোথা থেকে আসলো? দিন রাতের হিসেবই বা কেমন করে করা হলো? এক খালাতো বড়বোন বড় ভালোবাসতেন আমাকে। তার কাছে উত্তর জানতে চেয়েছিলাম, পাইনি। কিছু একটা

---

৬ ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী এই কথাগুলো ভুল। আল্লাহর একটি নাম আল-আলীম, অর্থাৎ সর্বজ্ঞানী। তিনি সবকিছু জানেন এবং সঠিকভাবে জানেন। স্রষ্টা আলো আবিষ্কার করার পরে বুঝতে পারবেন যে আলো আসলে ভালো—এটা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা বোঝায়। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা থেকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র। -সম্পাদক।

৭ আদিপুস্তক ১: ১৪-১৮

বলে কাটিয়ে দিলেন সেদিন। পরে মা সহ আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করেও লাভ হয়নি। মামি বলেছিলেন ধর্মের সাথে বিজ্ঞান মিলবে না এটাই নাকি স্বাভাবিক। ধর্ম নাকি যুক্তি দিয়ে চলে না। অথচ আমাদের বর্ধিত পরিবারে তাকেই বেশি ধার্মিক বলে জানতাম!

যত বড় হতে লাগলাম আমার চেনা-জানার-ভাবনার পরিসর আরও বেড়ে যেতে লাগল। মা আমাদের দুই বোনকে সব সময় কড়াকড়ির মধ্যে রাখার চেষ্টা করতেন। স্কুল আর কোচিং ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া নিষেধ ছিল। গেলেও মায়ের সাথে যেতে হতো। এমনকি স্কুলে কোনো সহ-শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুমতি পেতাম না। আমার নিজস্ব পৃথিবী স্কুল, চার্চ আর বাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শুধু বইয়ের পাতায় ছিল আমার অবাধ বিচরণ। যা পাই তা-ই গোগ্রাসে গিলে ফেলতাম। ভালো বই কিনে দেওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের কার্পণ্য ছিল না কখনো। আমার বই পড়ার অভ্যাসের পেছনে তার বিশাল অবদান রয়েছে। জন্মদিনে সবচাইতে খুশি হতাম বই উপহার পেলে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার কাছ থেকে দেশি-বিদেশি প্রচুর বই পেতাম। আর লোকজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে পড়া তো ছিলই। শুধু এই বই পড়ার নেশা থাকার কারণেই হয়তো আমার চিন্তা-চেতনা আশেপাশের বই না-পড়া খ্রিস্টান মেয়েদের চেয়ে অন্যভাবে গড়ে উঠছিল। যেগুলো আমাদের মা-বাবারা নির্দোষ শিশুতোষ বই মনে করে কিনে দিয়েছিলেন সেগুলো কখন যে কীভাবে কচি মনে নাস্তিকতার বীজ বুনে দিচ্ছিল তা তারা টেরও পাননি। অন্য ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা আগে থেকেই ছিল, এবার নিজের ধর্ম সম্পর্কে ধারণাও বদলে যেতে শুরু হলো।

খ্রিস্টান নান, যাদের আমরা সিস্টার বলে ডাকি, ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী তারা সন্ন্যাসিনীর মতো জীবনযাপন করেন। পরিবার থেকে দূরে আজীবন অবিবাহিত থেকে 'খ্রিস্টের সেবায়' তারা সারাটি জীবন পার করে দেন। দুষ্টু মেয়েরা বলত, অধিকাংশ সিস্টার নাকি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে এ পথে আসে। স্কুলে ধর্ম ক্লাসে সিস্টাররা যখন জানতে চাইতেন আমাদের মাঝে কে কে বড় হয়ে সিস্টার (নান) হতে চাই, কিছু মেয়ে নিয়মিত হাত তুলত। মজার ব্যাপার, বর্তমানে তারা প্রায় সবাই বিয়ে করে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসার করছে। আমি কখনো সিস্টার হতে চাইতাম না। যত ধার্মিক হই না কেন, কেন জানি এদের জীবনযাত্রা ভালো লাগত না আমার। আমার ধর্ম আমি নিজের মতো করে পালন করতে পছন্দ করতাম। সময়ের সাথে সাথে

ক্যাথলিক চার্চ—যাকে এ দেশে খ্রিষ্টমণ্ডলী বলা হয়, এর সাথে আমার আত্মার টান দিন দিন কমে যাচ্ছিল।

কোন ক্লাসে পড়ি তখন মনে নেই। শুনলাম গির্জায় এক ভিনদেশি ধর্মযাজক এসেছেন। তার বিশেষ আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রভাবে তার কাছে আশীর্বাদ নিতে গিয়ে মানুষ সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে। মা আমাদের দুই বোনকে নিয়ে গেলেন সেখানে। গির্জার ভেতরে সেদিন উপচে পড়া ভিড়। দূর দূর থেকে সব খ্রিষ্টানরা এসেছে সেই ফাদারের কাছে 'স্পেশাল ব্লেসিং' নিতে। লাইন দিয়ে এক এক জন যাচ্ছে তার সামনে, তিনি মাথার ওপর হাত নিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন পড়ছেন আর সাথে সাথে মানুষটা গা এলিয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে। দুজন লোক ধরাধরি করে একপাশে খোলা জায়গায় তাকে শুইয়ে দিচ্ছে। লাইনে আমার সামনে ছিল ছোটবোন, তারপর মা। মা আর বোন দুজনকেই পড়ে যেতে দেখলাম। সাথে সাথে তাদেরও সরিয়ে নেওয়া হলো। আমার পালা আসতেই তিনি হাত তুললেন আর আমি ঝুঁকে তার পা ছুঁয়ে সালাম করলাম, তারপর সোজা হেঁটে চলে আসলাম।

বাসায় ফেরার পর বাবার সাথে আলোচনা করে বুঝলাম লোকটার হাতে ক্লোরফর্ম জাতীয় কিছু একটা ছিল, নাকের কাছে হাত চলে আসলেই সবাই কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারাচ্ছিল। আমি ঝুঁকে পড়াতে সেটা আর কাজ করেনি। সে রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, কেন এই প্রতারণা! কী দরকার ছিল এতগুলো মানুষকে বোকা বানানোর? পরবর্তীতে এ ধরনের আরও কয়েকটা ঘটনা আমাকে ধর্ম সম্পর্কে—বিশেষ করে আমার নিজের ধর্ম—খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে আরও বেশি ভাবিয়ে তুলতে লাগল।

ক্লাস নাইনে যখন পড়ি আমরা ভাড়া বাসা ছেড়ে দিয়ে নানিদের বাড়ির ওপর তলায় এসে উঠলাম। বিকেল হলে নানির বাসায় খালাতো, মামাতো বোনদের সাথে প্রায়ই লুডো খেলতে চলে যাই, কখনো ছোট মামা এসে যোগ দেন খেলায়। চোখের সামনে দেখছি তিনি খেলায় চুরি করছেন, অথচ বাইবেলের কসম করে, মূর্তির আলটার ছুঁয়ে বলতেন তিনি করেননি। মামার এহেন আচরণ খুব কষ্ট দিত আমাকে। সামান্য কারণে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের কসম কেটে মিথ্যা বলা সম্ভব তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

এ সময় অ্যামেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনাটা ঘটল। তখন যেখানে কোচিং করতাম, সেখানে এক ছেলের নতুন দাড়ি গজিয়েছিল। ওকে লাদেন বলে খেপাতে লাগলাম। দাড়িওয়ালাদের সহ্য করতে পারতাম না আমি। সব জঙ্গির দল। অথচ কখনো মনে হতো না—যাকে সে সময় আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, যার কাছে নিয়মিত প্রার্থনা করি—সেই যিশুখ্রিস্ট নিজেই একজন দাড়িওয়ালা ছিলেন।

স্কুল পাশ করার পর মা বাসার কাছেই এক কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ক্লাসে আমাদের সেকশানে বোরখা পরা এক মেয়ে পড়ে। মাথার ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। প্রায় দুইটা বছর আমরা একসাথে একই বেঞ্চে বসে ক্লাস করলাম, কখনো ওর সাথে কথা পর্যন্ত বলিনি, পাশে বসা তো দূরের কথা। আমি খ্রিস্টান বলেই হয়তো, মেয়েটিও আমার সাথে একটা দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে চলত। কিন্তু যে মেয়েটা শুধু মাথায় একটা স্কার্ফ পরে আসে, ইসলাম নিয়ে কোনো কথা বলে না—তার সাথে ভালোই বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমার। সেই সাথে আরও কিছু মুসলিম নামধারী নতুন বন্ধু জুটে গেল।

এর মাঝেই বাবা হঠাৎ একদিন বললেন, স্বর্গ-নরক বলতে আসলে কিছু নেই। মৃত্যুর সাথে নাকি সব শেষ। এরপর পরকাল বলতে কিছু নেই। আমাদের পাপ-পুণ্যের শাস্তি আর পুরস্কার আমরা পৃথিবীতেই পেয়ে যাই। কে জানে, হয়তো সেদিন থেকেই ধর্মের ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাওয়া শুরু হলো আমার।

স্কুলে থাকাকালীন ভালো স্টুডেন্ট হিসেবে পরিচিত ছিলাম। শ খানেক ছাত্রীর মধ্যে প্রথম দশের ঘরে স্থান হতো। ক্লাস পার্ফরম্যান্স সন্তোষজনক ছিল। হেডমিস্ট্রেস সহ সব শিক্ষক-শিক্ষিকা পছন্দ করতেন আমাকে। আমাকে নিয়ে তাদের আশা ছিল অনেক। কিন্তু তাদের হতাশ করি আমি। সপরিবারে খ্রিস্টান-পাড়ায় চলে আসার পর মূলত আমার অধঃপতনের শুরু।

কলেজে পড়ছিলাম তখন। বাবার অটোমোবাইলসের ব্যবসা ভালোই চলছিল। তার কাছ থেকে প্রতিদিন হাতখরচের জন্য কিছু টাকা পেতাম। যখন যত চাই।

আমাকে একটা মোবাইল কিনে দিয়েছিলেন তিনি। সেই সময়ে, যখন ওই বয়সী ছেলেমেয়ের মোবাইল থাকা তো দূরের কথা, বড়দের মধ্যে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যাও ছিল খুব কম। বান্ধবী অথবা কাজিনদের নিয়ে যখন তখন আড্ডা। বাসায় ছিল আনলিমিটেড ইন্টারনেট কানেকশান। গেইম খেলতাম, গান ডাউনলোড করে করে হার্ডডিস্ক ভরে ফেলেছিলাম। পাঠ্যবই বাদে অন্য সব বই পড়তে বেশি ভালো লাগত। শিক্ষাজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়টাতে সময় নষ্ট করার প্রায় সব উপকরণ সামনে ছিল আমার। সময়ের গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা ভুলে গিয়ে বর্তমান নিয়ে পড়ে রইলাম।

কাজেই যা হওয়ার তা-ই হলো। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারলাম না। খুব ভেঙে পড়লাম। নতুন করে স্বপ্ন দেখানোর মতো দূরদর্শী কেউ ছিল না পাশে আমার। এই ব্যর্থতার পেছনে বাবা-মাকেই দায়ী বলে মনে হলো। তাদের প্রতি একটা ক্ষোভ জন্ম নিল মনে। আর নিজের প্রতি ঘৃণা।

এদিকে কাছের এক বান্ধবী কাঙ্খিত ফলাফল না পেয়ে আত্মহননের ব্যর্থ চেষ্টার ফলে তখন হাসপাতালে ভর্তি। ওর কথা ভেবে সান্ত্বনা দিলাম নিজেকে। অন্তত পাশ তো করতে পেরেছি।

শুনেছি ঈশ্বর যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। যা ঘটেছে তা যে আমার জন্য সত্যিকার অর্থে কল্যাণকর ছিল তা বুঝেছি অনেক পরে।

মিশনারি স্কুল থেকে বের হয়ে এসেছিলাম, মুসলিমদের সাথে মেলামেশা করছিলাম, অথবা ধর্মহীনদের লেখা বইপত্র পড়ছিলাম বলেই কী না জানি না—মনের অজান্তে ধীরে ধীরে ধর্ম নামক বস্তুটি থেকে দূরে সরে আসতে লাগলাম। যদিও তখনও নিজেকে খ্রিস্টান বলে দাবি করতাম, খ্রিস্টধর্মকে ভালোবাসতাম। কিন্তু আগের মতো আর 'প্র্যাক্টিসিং' রইলাম না। গির্জায় যেতে আর ভালো লাগতো না। মনে হতো সেখানে প্রার্থনা করতে না, মুখে-ঠোঁটে রঙ মেখে পার্টিতে যাচ্ছে সবাই। আমার ধারণা ছিল যে মনে-প্রাণে বিশ্বাস আর ভক্তি সহকারে মিশায়[৮] যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেখানে যায় শুধু বয়স্ক কিছু লোকজন। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে

---

৮ মুসলিমদের শুক্রবারে জুম'আর জামাতের মতো রোববারে গির্জার জমায়েতকে মিশা (Mass) বলে।

তাদের সংখ্যা খুব কম। ফাদারের কাছে যিশুর নামে একই কথা বার বার শোনা, মুখস্থ কিছু বুলি আওড়ানো—বিরক্তিকর মনে হতে লাগল।

আমার দৃষ্টিতে ইসলাম বরাবরই ছিল একটা বর্বর ধর্ম। এরা বছরের একটি বিশেষ দিনে হাজার হাজার পশু হত্যা করে উৎসব পালন করে। যুদ্ধ করে, মানুষ মেরে এরা উল্লাস করে। বহুবিবাহ অথবা বাল্যবিবাহ বৈধ বলে মানে। শুনেছি মুহাম্মাদের নাকি অনেকগুলো স্ত্রী ছিল। মেয়েদের এরা মানুষ বলে মনে করে না। পর্দার নামে জোর করে তাদের নিনজা-টাইপ পোশাক পরিয়ে বন্দী করে রাখা হয়। কিছু নিম্নশ্রেণির অশিক্ষিত বুদ্ধিহীন লোকজন এই ধর্ম নিজেদের জীবনে মেনে চলে। ইসলাম পালনকারী মুসলিমরা সব জঙ্গি নয়তো রাজাকারের দল। ভাগ্যিস আমার যেসব মুসলিম বন্ধু রয়েছে তারা কেউ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে না। বরং তারাও হুজুর টাইপের ছেলে-পেলেদের পছন্দ করে না খুব একটা।

ইয়াহু মেইলের স্প্যাম ফোল্ডার চেক করছিলাম একদিন। অনেক সময় দরকারি মেইল ওখানে চলে যায়। হঠাৎ চোখে পড়ল বাংলা ভাষায় অনলাইনে কুরআন পড়া নিয়ে কী একটা মেইল এসেছে। কী মনে করে মেইলটা ওপেন করলাম। quraanshareef.org নামের একটা ওয়েবসাইটের কথা বলা হয়েছে। এখানে নাকি বাংলা ভাষায় কুরআন পড়া যাবে। ক্লিক করার পর একটা সাইট ওপেন হলো। আরবী, বাংলা আর ইংরেজিতে লেখা কুরআনের একেকটা বাক্য। মজা করার জন্য প্রথম দিকের আরবীতে লেখা একটা লাইন কপি করে msn messenger এ স্ট্যাটাস দিয়ে দিলাম (সেসময় ফেসবুকের অস্তিত্ব ছিল না)। কে কী মনে করেছিল জানি না, তবে আমার এক মামা ওই স্ট্যাটাস দেখে মাকে বলে দিয়েছিলেন। সে কী বকা খেলাম সেদিন! মা কেন যেন ভয় পেয়েছিলেন বলে মনে হলো। আমি যে স্রেফ মজা করার উদ্দেশ্যে মুসলিমদের কুরআন থেকে আরবীতে স্ট্যাটাস দিয়েছি, কেন যেন তা সহজে মেনে নিতে পারলেন না তিনি।

আরেকবার মুসলিমদের রোযার পর যে ঈদ হয়, তার আগের রাতে মোবাইল অপারেটর থেকে মেসেজ আসল যে ঈদ উপলক্ষে বন্ধুদের গান উৎসর্গ করা যাবে। এবারো মজা করার জন্য পয়সা খরচ করে কয়েকজনকে গান পাঠালাম। আমার

শোনা দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষ্যাত গান—ও মোর রমযানের ওই রোযার শেষে এল খুশির ঈদ... ।

বাইবেল বা অন্য কোনো ধর্মীয় বই পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম ততদিনে। কী লাভ ওসব পড়ে। যাদের বেশি বেশি ধর্মকর্ম করতে দেখা যেত, তাদের নিজেদের জীবনে যিশুর শিক্ষার প্রতিফলন দেখতে পেতাম না। খুব কষ্ট আমার। মনে হতো—মানুষের দ্বারা পৃথিবীতে যে এতগুলো ধর্ম তৈরি হয়েছে, এত কাহিনি রচিত হয়েছে তার পেছনে উদ্দেশ্য তো একটাই। আমরা যেন সৎ পথে চলি, আচার-আচরণে ভালো হই। অথচ ধর্মের রিচুয়ালগুলো নিয়মিত মেনে চলা মানুষগুলোকে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি পাপে লিপ্ত। এই ধর্মের কারণেই পৃথিবীতে যত দুঃখ-কষ্ট, ভেদাভেদ।

সাধারণ খ্রিস্টানদের দেখতাম ধর্মের সাধারণ বিষয়গুলো সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা নেই। কোন রিচুয়াল কেন পালন করা হয়, ঐতিহাসিক ভিত্তি কী, বাইবেলে আদৌ বলা হয়েছে কি না এসব জানার প্রয়োজন বোধ করে না কেউ। কলেজে উঠার অনেক আগেই ধর্মের বই পড়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। ওগুলোর স্থান দখল করে নিয়েছিল সেবা প্রকাশনী, জাফর ইকবাল, হ্যারি পটার আর দেশি-বিদেশি কিছু বিখ্যাত লেখকদের হাবিজাবি উপন্যাস।

মূর্তিপূজারিদের বাইবেলে পৌত্তলিক বলা হয়। স্কুলের ধর্মশিক্ষা বইতে পড়েছি ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা—যা তিনি মোশির কাছে দিয়েছিলেন। সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে ইশ্বর ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করা নিষিদ্ধ। অথচ আমাদের গির্জাগুলোতে মূর্তির ছড়াছড়ি!

❛ আমিই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। আমিই তোমাদের মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছি। তাই তোমরা এই নির্দেশগুলো মানবে: 'আমাকে ছাড়া তোমরা আর কোনো দেবতাকে উপাসনা করবে না।

❛ তোমরা অবশ্যই অন্য কোনো মূর্তি গড়বে না যেগুলো আকাশের, ভূমির অথবা জলের নিচের কোনো প্রাণীর মতো দেখতে। কোনো মূর্তির উপাসনা

বা সেবা করবে না। কারণ, আমিই প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর। যারা অন্য দেবতার উপাসনা করবে তাদের আমি ঘৃণা করি।'[৯]

একজন মানুষ কী করে সজ্ঞানে মানুষের তৈরি প্রাণহীন মূর্তির কাছে প্রার্থনা করে তা যেন আর বোধগম্য হতে চাইল না। কমন সেন্সের ব্যাপার। ছেলেবেলায় মা-নানিরা যখন বলতেন মিসা শেষে মূর্তিগুলোর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে আসতে, দৌড়ে চলে যেতাম কে কার আগে সবগুলো মূর্তির পা ছুঁতে পারি। অবুঝ শিশু ছিলাম বলে এই সহজ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতাম না যে মাটির মূর্তির কোনো ক্ষমতা নেই কিছু শোনার বা দেখার। অথচ জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক লোকজনের মাথায় কেমন করে ঢোকে না এই সহজ ব্যাপারটা?

সনাতন হিন্দুদের ধর্মকে আজীবন মিথ্যা বলেই জেনে এসেছি। রূপকথার মতো কল্পকাহিনিতে ভরা আজব এক ধর্ম। এই ধর্মের ৯০ শতাংশ অনুসারীও দেখেছি মন থেকে বিশ্বাস করে না এসব। অথচ আমরা তো ওদেরই মতো মানুষের তৈরি মূর্তি পূজা করি।

৭.

কলেজ শেষে অন্য কোথাও ভর্তির জন্য তেমন চেষ্টা না করেই হুট করে ভর্তি হয়ে গেলাম এক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে। মায়ের রক্ষণশীলতার কারণে এবারও বাসা থেকে সবচেয়ে কম দূরত্বে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটি বেছে নিতে হলো। শুরুর দিন বিশ্ববিদ্যালয়টির দায়িত্বশীল কিছু দাড়িওয়ালা লোক কয়েক ঘণ্টা বক্তৃতা দিলেন। প্রত্যেকের বক্তব্যের প্রধান অংশ জুড়ে একটা কথাই ছিল। এই প্রতিষ্ঠানে যেকোনো ধরনের 'ফ্রি মিক্সিং' মানে ছেলে-মেয়েতে অবাধ মেলামেশা নিষেধ। ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা ক্লাস হবে। পরে জানলাম এটা নাকি কোনো এক ইসলামী রাজনৈতিক দলের করা প্রতিষ্ঠান। এখানে ইসলামের ওপর কয়েকটা বাধ্যতামূলক কোর্সও করতে হবে। খোঁজ নিয়ে আরও জানলাম আমি খ্রিষ্টান বলে ওই কোর্সগুলো

৯ যাত্রাপুস্তক ২০: ২-৬

বাদ দেওয়ার কোনো উপায় নেই। এতগুলো টাকা দিয়ে ভর্তি হয়েছি—কী আর করা। বাধ্য হয়ে মেনে নিলাম।

প্রথম কোর্স ছিল ইসলামী নৈতিকতার ওপরে। ক্লাসে স্যার ইসলামের গুণাগুণ বর্ণনা করতেন আর আমি হতাম মহাবিরক্ত। ইসলাম নাকি একমাত্র সত্য ধর্ম, অন্য সব ধর্ম মানুষের তৈরি, শুধু ইসলামেই অন্য ধর্মগুলোর মতো পৌরাণিক কাহিনি বলতে কিছু নেই...ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য ধর্ম, বিশেষ করে খ্রিষ্টধর্মের ভুলগুলো নিয়ে যখন সমালোচনা করেন, কীভাবে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে এদের ধর্মীয় নিয়ম-কানুন যুগে যুগে বদলেছে অথচ ইসলামে ১৪০০ বছর আগে যা ছিল এখনো তা-ই আছে—এসব শুনে মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। মনে হতো তারা ইচ্ছে করেই নিজের ধর্মের প্রশংসা আর অন্য ধর্মের বদনাম করছে। মানতে চাইত না মন। তবে পরীক্ষায় পাশের জন্য ইসলামের অনেক কিছু শিখে ফেলতে লাগলাম। পরিচিত হতে লাগলাম নতুন নতুন তত্ত্ব, নতুন নতুন শব্দের সাথে। ইসলামী শারিয়াহ, ফিক্‌হ, সুন্নাহ, মাযহাব, ইযমা, ক্বিয়াস, সাহাবী, তাবিই, তাবিইন ইত্যাদি। জানলাম কেমন করে কুরআন নাযিল হয়েছিল, কেমন করে হাদীস এসেছে। ইসলামের একেবারে মৌলিক কিছু ব্যাপার-স্যাপার। এ দেশে নাকি ৮৯% মুসলিম, বাকি সব অন্য ধর্মের অনুসারী। অথচ ইসলাম সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানা ছিল না আগে। শুনলাম এগুলো না জানলে বা না মানলে নাকি মুসলিম হওয়া যায় না। অথচ কখনো দেখিনি এসব বিষয় নিয়ে চারপাশের মুসলিমদের মাথা ঘামাতে। আমার মতো আমার মুসলিম সহপাঠীদেরও দেখলাম ইসলামের অনেক কিছুই জানা নেই। তারাও আমার মতো বাধ্য হয়েই পড়ত বলে মনে হতো।

আমি মুসলিম না, এসব বিশ্বাস করি না বা মানি না—এটা বোঝানোর জন্যই হয়তো গলায় বড়সড় এক ক্রুশ ঝুলিয়ে ক্লাসে যাওয়া শুরু করলাম। যেকোনো সমস্যায় অথবা বিশেষ বিশেষ সময়ে বুকে ক্রুশের চিহ্ন আঁকার অভ্যাস আগে থেকেই ছিল। সে সময় যখন তখন এই কাজটা করতে লাগলাম। রেডিও শোনার বদঅভ্যাস ছিল সে সময়। শুক্রবারে রেডিওতে কুরআন শুনতে পেলে বিরক্তির সাথে বন্ধ করে দিতাম। অসহ্য লাগত কুরআন তেলাওয়াত।

এদিকে ইসলাম সম্পর্কে যত জানছিলাম তত নিজের ধর্মের প্রতি একেবারেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে লাগলাম। মনে হলো সব ধর্মই মানুষের তৈরি। ধর্ম না মানলেও চলে। আবার যারা ধর্ম মেনে চলে তাদের মাঝে খারাপ মানুষের সংখ্যাই বেশি। ধর্ম মানুষের মাঝে বিভেদ তৈরি করে দেয়। বুঝতে পারছিলাম যে ধীরে ধীরে এগ্নস্টিক (agnostic) হয়ে যাচ্ছি আমি। নিজেকে নাস্তিক বলতে ভয় পেতাম, তখনও হয়তো ইশ্বরের ভয় কিছুটা অবশিষ্ট ছিল মনে।

একসময় ব্যক্তিগত ধর্মকর্ম একেবারেই বাদ দিয়ে দিলাম। মায়ের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে নতুন জামা পরতে হতো, সেজেগুজে গির্জায় যেতে হতো। সারাবছর ধর্ম থেকে দূরে থেকে শুধু উৎসবের দিনগুলো পালন করব, নতুন জামা পরে ঘুরে বেড়াব—এটা চরম নির্লজ্জ আচরণ লাগত আমার কাছে।

বই পড়া আর গান শোনার অভ্যাস নেশায় পরিণত হলো। দিন-রাত গান শুনতাম মেটাল ধাঁচের গান বেশি পছন্দ ছিল। আন্ডারগ্রাউন্ড মিউজিকের ভক্ত হয়ে গেলাম। বাসায় কেউ না থাকলে হাই ভলিউমে শুনি। ছোট ভাই তখন গিটার শেখে আর বাসায় এসে আমাকে শেখায়। ধার্মিক প্রকৃতির ভালোমানুষ আগের আমি কখন যে বদলে যেতে লাগলাম নিজেও টের পেলাম না। বদলে গেলাম পোশাক-আশাক, চাল-চলন, কথাবার্তা, বন্ধু-বান্ধব সব কিছুতেই। নিজের চেহারার প্রতি মনোযোগ দেওয়া শুরু করলাম। চুল স্টাইল করে কাটালাম, রঙ করালাম। চশমা বদলে চোখে ধূসর রঙের কন্টাক্ট লেন্স লাগালাম। ধীরে ধীরে পুরো জীবনধারাই বদলে গেল আমার।

এরমধ্যেই পড়ে ফেললাম *দি দ্য ভিঞ্চি কোড* বইটি। এই বই পড়ার পর খ্রিষ্টবাদের ওপর ছিটেফোঁটা যতটুকু বিশ্বাস ছিল তাও চলে গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে গেলাম আমি।

এর মাঝেই, হঠাৎ একদিন মেজোমামা চলে গেলেন না ফেরার দেশে। খুব অসুস্থ ছিলেন তিনি। আমাকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতেন। জ্ঞান হওয়ার পর তার মৃত্যুটাই ছিল আমার জীবনে সবচেয়ে কাছে থেকে দেখা একটি মৃত্যু। যতই আস্তিক

হই আর নাস্তিক—মৃত্যু ঠেকাতে পারে এমন সাধ্য আছে কার? কাল যে মানুষটা নিশ্চিন্তে দুনিয়ার বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আজ তিনি নেই। কোথাও নেই। শুধু দেহটা পড়ে আছে নিথর, নিশ্চুপ। চারপাশের লোকজন সবাই আছে শুধু মেজোমামা নেই। লাশটা ধুয়ে কবর দিতে নিয়ে যাওয়ার আগে আস্তে করে ছুঁয়ে দেখলাম, বরফ-শীতল কঠিন। আমার মা, নানি, মামা-খালারা আর মামাতো-খালাতো ভাই-বোনেরা সবাই খুব কাঁদছিল। কেন জানি একটুও কান্না আসলো না আমার। অনেক কষ্টে একটু কাঁদার চেষ্টা করেছিলাম শুধু লোকে-কী-বলবে ভেবে। দূর থেকে চুপচাপ দেখছিলাম শুধু। ধর্ম থেকে দূরে সরে গেলে এভাবেই মনটা শক্ত হয়ে যায় হয়তো।

এ ঘটনার পর ধর্ম নিয়ে আমার চিন্তাধারা আবার অন্যদিকে মোড় নিতে শুরু করল। জানতে পারলাম খ্রিস্টান কেউ মারা গেলে কিছু রিচুয়াল পালন করতে হয়। তার 'চল্লিশা' করতে হয়। চল্লিশদিন সন্ধ্যায় তার আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রার্থনা করতে হয়। অবিশ্বাসী মন নিয়ে আমিও মহোৎসাহে যোগ দিলাম।

মামার মৃত্যু উপলক্ষে প্রতি সন্ধ্যায় নানির বাসায় প্রার্থনা সভা বসতে লাগল। আমরা মামাতো-খালাতো ভাই-বোনেরা সব বড়দের সাথে বসে জপমালার প্রার্থনা করি। না, খ্রিস্টানদের রোসারি বিডস[১০] এর ধারণা হিন্দুদের জপমালা থেকে আসেনি। রোমান ক্যাথলিকরা বহু আগে থেকেই এটা করে আসছে। যিশুখ্রিস্টের মা মারিয়ামের মূর্তি সামনে রেখে তার উদ্দেশে করা হয় এই বিশেষ প্রার্থনা। একজন চালক পুরো প্রার্থনাটা পরিচালিত করেন। তার সাথে সাথে বাকিরা পড়ে। জপমালা জপা শেষে চালকের সাথে 'লিটানি' আওড়াতে হয়। লিটানি হলো একপ্রকার বিশেষ প্রার্থনা যেখানে চালক এক এক করে যিশুর মা মারিয়ার নামে বিভিন্ন উপমা, খ্রিস্টধর্মের কিছু উল্লেখযোগ্য স্থান বা বস্তুর নামের লম্বা তালিকা বলে যেতে থাকেন, আর সাথে বাকি সবাইকে তাদের কাছে সুপারিশ করতে হয়—'আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো' বলে। এ লিটানিতে মারিয়াকে কুমারী মা, ঈশ্বরের মা, স্রষ্টার মা, রানি ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। বড়মামা আমাদের প্রার্থনার চালক ছিলেন। যখন 'দাউদের দূর্গ', 'স্বর্ণের গৃহ', 'স্বর্গের দ্বার' অথবা 'ভোরের তারার' কাছে প্রার্থনা করতে বলা হতো, আমরা কম বয়সীরা চোখাচোখি করে হাসাহাসি করতাম। এগুলো কী

---

১০ অনেকটা আমাদের দেশে ব্যবহৃত তসবির মতো সুতোয় গাঁথা পুতির মালা। অনেক আলিম এটার ব্যবহার মুসলিমদের জন্য নিরুৎসাহিত করে বলেছেন আঙুলের করে তাসবিহ গণনা করা উত্তম। -সম্পাদক।।

করে আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করবে! সবাই বুঝতাম যে পুরো ব্যাপারটি হাস্যকর, তারপরও কী কারণে যেন আমরা ভয় পেতাম তা সবার সামনে প্রকাশ করতে।

কিছুদিন যাওয়ার পর আমাদের এই সান্ধ্যকালীন প্রার্থনাসভায় লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগল। বিভিন্ন কাজের অজুহাতে প্রথমে পুরুষরা, পরে মহিলারাও আর আসেন না। এক খালা দেখা যেত প্রার্থনা শুরুর কিছুক্ষণ পরই ঘুমিয়ে পড়তেন। শেষে দেখা গেল নানির সাথে শুধু আমরা কয়েকজন নাতনি আছি। আমি তখন বই দেখে দেখে প্রার্থনা চালাতে লাগলাম। কেন যেন বেশ উপভোগ করেছিলাম ব্যাপারটা।

ধর্ম সম্পর্কে আমার ধারণা তখন অন্যান্য সাধারণ ধর্মাবলম্বীদের মতো ছিল। যার যার ধর্ম তার তার। সব ধর্ম আসলে মানুষের তৈরি। আমি আমারটা মানি, তুমি তোমারটা। আবার কিছু না মানলেও ক্ষতি নেই—মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।[১১]

ভার্সিটিতে আবার নতুন উদ্যমে পড়াশোনায় মনযোগ দিয়েছিলাম। ভালোই চলছিল সবকিছু। হঠাৎ কী যে হয়ে গেল, আবারও বিপর্যয় নেমে এল আমার জীবনে। কয়েক সেমেস্টার পড়ার পর হঠাৎ করেই বাবার ব্যবসায় বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। বলে দিলেন ভার্সিটিতে এবার আমার সেমেস্টার ফি দিতে পারবেন না। এদিকে সামনে ফাইনাল পরীক্ষা। নিয়মিত সব ক্লাস করেছি; ক্লাস টেস্ট, কুইজগুলোতে মোটামুটি সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়ে এসেছি। ক্লাস পারফরমেন্স সন্তোষজনক। পরীক্ষার প্রস্তুতিও শেষ। অথচ টাকা না দিলে অ্যাডমিট কার্ড পাব না!

টাকা যোগাড় হলো না—পরীক্ষা দিতে পারলাম না। অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরলাম। নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম, একটা সেমেস্টার মিস গেলে এমন কিছু যায় আসে না। কোর্সগুলি পরে নিয়ে নেওয়া যাবে।

পরের সেমেস্টারে একই অবস্থা। আমি তখন পাগলের মতো টিউশনি খুঁজে বেড়াচ্ছি। ক্লাসেও নিয়মিত যাই না। গিয়ে কী হবে, পরীক্ষা তো দিতে পারব না।

---

১১ মানবধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম কথাটি স্ববিরোধী। সব মানুষের আচরিত সব ধর্ম একই সাথে শ্রেষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়। আর যদি মানবধর্ম বলতে মানুষের সেবা করা বোঝানো হয়—তবে সেটা নিজে একটি আলাদা ধর্ম হতে পারে না। প্রতিটি ধর্মেই অন্য মানুষের সেবা বা উপকার করা একটু অনুষঙ্গ হিসেবে বর্তমান। -সম্পাদক।

আমি টিউশনি পেলাম। তবে যা আয় হবে তা দিয়ে একবারে পরীক্ষার ফি শোধ করা সম্ভব না। আবার আরেকটা ফাইনাল পরীক্ষা এসে চলে গেল। ইশ্বর যদি সত্যিই থেকে থাকেন তাহলে কেন এমন হলো! হতাশায় ভেঙে পড়লাম আমি।

সেমেস্টার ফাইনাল দিতে না পারায় সেই এক মাস প্রতিটা দিন অলস সময় কাটাই। হতাশায় জর্জরিত আমি জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে লাগলাম। কী হবে আর বেঁচে থেকে। একবার সিদ্ধান্ত নিলাম সুইসাইড করে ফেলব। আমার নিজের ভুলের কারণেই এই অবস্থা, ফলে নিজেকেই শাস্তি দেব। মনে মনে সব ঠিক ঠাক করে ফেললেও সাহসের অভাবে আর করা হয়ে ওঠেনি।

মানসিকভাবে বিপর্যস্থ আমি প্রচণ্ড কষ্টে হতাশায় দিনরাত বসে বসে কাঁদতাম, কারও সাথে কথা বলতাম না, কোথাও যেতাম না। মনে হতো যদি অন্য কোনো পৃথিবীতে, অন্য আরেক জীবন পেতাম। আমার পরিবার, চারপাশের পরিবেশ, লোকজন—সব অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সবকিছু আবার নতুন করে শুরু করতে পারতাম যদি!

এরপর কয়েকটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। এমন কিছু ঘটনা যা আমার পুরো জীবনটাই পাল্টে দিল। সত্যিকার অর্থেই আমি যেন ভিন্ন এক জগতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন শুরু করতে পেরেছিলাম।

২০০৭ এর শেষের দিকের কথা। বাসায় তখন কোনো এক কারণে ইন্টারনেটের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। সেই ছোটবেলা থেকেই তো বইয়ের পোকা আমি। স্কুলে নতুন ক্লাসের নতুন বই হাতে পেলে একনাগারে পুরোটা পড়ে শেষ করে ফেলতাম—কিছু বুঝি আর না-বুঝি। তাই হতাশাগ্রস্থ আমি সময় কাটানোর জন্য বাসায় যতগুলো বই ছিল একে একে পড়া শুরু করলাম। পছন্দের কিছু বই দ্বিতীয়-তৃতীয়বার পড়ে ফেলার পর হুমায়ূন আহমেদ থেকে শুরু করে সত্যজিত রায়, রবিঠাকুরের যাবতীয় লেখার সমগ্র, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্রের মতো দাঁতভাঙা সাহিত্যের বইগুলো পর্যন্ত পড়ে শেষ করলাম। এবার বাকি থাকল বাইবেল।

বাইবেল থেকে একসময় নোট করে করে পড়ার অভ্যাস ছিল আমার। তবে সব পড়াই নতুন নিয়মের (old testament) প্রথম চারটা সুসমাচারে (gospels) সীমাবদ্ধ ছিল। অন্যান্য বই থেকে বাইবেলের গল্প পড়লেও কখনো সম্পূর্ণ বাইবেলটা পড়ার সুযোগ হয়নি। ভাবলাম সব বই যখন পড়া শেষ, এবার এটাই বা বাকি থাকবে কেন? একেবারে প্রথম থেকে পড়া শুরু করে দিলাম। তবে এবার নিছক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে, হয়তোবা খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে আরেকটু বেশি জানার উদ্দেশ্যে। ধর্মীয় চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত তখন।

বাইবেল পড়ছি আর ধর্ম নিয়ে ভাবছি। একসময় এত ধার্মিক খ্রিস্টান ছিলাম অথচ কখনো নিজের ধর্মগ্রন্থ পুরোটা পড়ার কথা মনে হয়নি। যা শুনেছি, পাঠ্যবইসহ অন্যান্য বইয়ে পড়েছি, তাই মেনে নিয়েছি। অথচ বাইবেল যতই পড়ছিলাম আশ্চর্য হচ্ছিলাম। ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচটি খণ্ড বা পুস্তককে একসাথে বলা হয় পেন্টাটিউক (তোরাহ)। পাঁচটি খণ্ড হচ্ছে আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণ। পুরোনো নিয়মের যে ২৯টি খণ্ডের সংগ্রহ আছে, তাঁর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে এ পাঁচটি। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম এখানে একজন আরেকজনের সাথে দেখা হলে তার শান্তি কামনা করে—ঠিক যেমন মুসলিমরা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেয়। বাংলা সাধু রীতিতে লেখা বাইবেলের অনুবাদের প্রথম পাঁচটি খণ্ড বহু কষ্টে পড়ে শেষ করলাম। কেন জানি খুব বোরিং লেগেছিল। এরপর বাকি অংশ পড়ার ধৈর্য ছিল না আর। সোজা চলে গেলাম নিউ টেস্টামেন্টে।

নিউ টেস্টামেন্টকে বাংলায় লেখা হয় নতুন নিয়ম বা নববিধান। যিশুর জীবনবৃত্তান্ত পড়া শুরু করলাম। এখানে আরও বেশি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। চারটি ভিন্ন ভিন্ন গসপেলে যিশুর কাহিনি ভিন্নভাবে লেখা। আমার নিজের কাছেই বেশ কয়েকটা অসঙ্গতি চোখে পড়ল। যার কোনো বায়োলজিকাল ফাদার নেই, তাঁর বংশ পরিচয় আসলো কোত্থেকে! তবে যিশুর কথাগুলি পড়ে আমি তাঁকে ভালোবেসে ফেললাম। কী অসাধারণ একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, কী অসাধারণ তাঁর কথাগুলো! পড়লাম ইহুদি ধর্মের অনুসারী যিশুর মৃত্যুর পর কেমন করে তাঁর বাণী ধীরে ধীরে প্রচার প্রসার লাভ করছিল। খ্রিস্টের নতুন অনুসারীরা তাঁর মৃত্যুর পর নিজেদের খ্রিস্টান নামে অভিহিত করা শুরু করেছিল—এই ব্যাপারটি বেশ আলোড়িত করেছিল

আমাকে।[১২] এই অংশটি পড়ার সাথে সাথে বাসার সবাইকে জানিয়েছিলাম। অর্থাৎ তিনি বেঁচে থাকাকালীন খ্রিষ্টধর্ম নামে কোনো আলাদা ধর্ম ছিল না। তিনি নতুন কোনো ধর্মের প্রবর্তন করেননি। বরং তাঁর পরবর্তী অনুসারীরা এই কাজটি করেছে। তিনি নিজেও বলেছিলেন:

> ‘ভেবো না যে আমি মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এসেছি। আমি তা ধ্বংস করতে আসিনি বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি।’ [১৩]

ট্রিনিটি বা ত্রিত্ব নিয়ে সংশয় আমার বহু আগে থেকেই ছিল। বড়দের প্রশ্ন করে এর সন্তোষজনক উত্তর পাইনি কখনো। বাইবেলেও ‘ত্রিত্ব’ শব্দটি খুঁজে পেলাম না। আমরা যে বুকে ক্রুশের চিহ্ন আঁকি, তার কথাও বলা নেই কোথাও। সারাজীবন শুনে এসেছি যিশুই নাকি ঈশ্বর। অথচ বাইবেলে তিনি বলেন:

> ‘যারা আমাকে ‘প্রভু, প্রভু’ বলে তাদের প্রত্যেকেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে তা নয়। আমার স্বর্গের পিতার ইচ্ছা যে পালন করবে, কেবল সে-ই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে।’ [১৪]

কীভাবে রোমান মূর্তিপূজারি পেগানদের সাথে যিশুর অনুসারীদের ধর্ম মিলে খ্রিষ্টধর্মের নিয়ম-কানুন তৈরি হয়েছিল ড্যান ব্রাউনের বইয়ে এই ব্যাপারগুলো আগেই পড়েছিলাম, তারপরেও অদ্ভুত লাগল ব্যাপারটা। Saint Paul বা সাধু পৌলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যিশুর মৃত্যুর পর কেমন করে নতুন এক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল, বাইবেলেই লেখা আছে সব। অথচ আমরা সাধারণ খ্রিষ্টানরা এর কিছুই জানি না, বা জানলেও এসব নিয়ে ভাবার প্রয়োজন বোধ করি না। হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। যদি আমার চারপাশের খ্রিষ্টানদের পুরো বাইবেলটা পড়তে দিতে পারতাম। যদি তাদের বোঝাতে পারতাম তারা গির্জায় গিয়ে যে মূর্তির কাছে চাইছে তার কোনো ক্ষমতা নেই কিছু করার। কারণ, পুরো ব্যাপারটাই তো মিথ্যা। যেকোনো বিবেকবান চিন্তাশীল মানুষের বোঝার কথা।

---

১২ শিষ্যচরিত ১১:২৬

১৩ মথি ৫:১৭

১৪ মথি ৭:২১

কেমন করে আমরা নিজেদের কোনো একটা ধর্মের অনুসারী হিসেবে দাবি করি, যদি আমরা সেই ধর্মের ওপর পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করতে না পারি? মুখে বলি বিশ্বাস করি। অথচ বিশ্বাস করলে মানতে চাই না কেন? মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই নিজেদের বাপ-দাদার ধর্মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলেছি। যারা অন্ধ অনুসরণ করে না তারাও পুরোটা মানে না। শুধু যে অংশটুকু ভালো লাগে, তা মানে; শুধু সেটুকু মানে যা পার্থিব সুবিধা দেয়।

আমরা নিজেদের যদি প্রশ্ন করি, সত্যিই কি আমি পরকালে বিশ্বাস করি কি না; পুনরুত্থান, বিচারদিবসে বিশ্বাস করি—কথাগুলো কি শুধু মুখে মুখে উচ্চারণ করি, নাকি অন্তর থেকেও মানি? একজন পরকালে বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব না জেনেশুনে কোনো পাপ কাজ করা। ধর্মবিরোধী কাজ, যাকে আমরা ঈশ্বর বলে মানি—তিনি অসন্তুষ্ট হন এমন কিছু করা।

আমরা ধর্ম পালনের নামে যা করছি তা কি ইশ্বরের নির্দেশিত পন্থায় করছি? নাকি অন্ধের মতো পূর্ববর্তী লোকদের কথা মেনে চলছি? আমরা এমন একজনের কাছে প্রার্থনা করি যিনি নিজেই তাঁর সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতেন। এমন একটা ধর্ম মানি যার নামটাই মানুষের তৈরি। আমাদের এমন একটা ধর্মগ্রন্থ যা অবৈজ্ঞানিক আর স্ববিরোধী বক্তব্যে ভরপুর। আবার এমন কিছু ধর্মীয় উৎসব আর প্রথা পালন করি ধর্মগ্রন্থে যার কোনো ভিত্তিই নেই।

মা লক্ষ করলেন আমার পরিবর্তনটা। তিনি বুঝতে পারলেন ভার্সিটির পড়াশোনা বন্ধ হওয়াতে আমি কতটা হতাশ, কতটা মানসিক কষ্টে দিন যাপন করছি। রবিবারে যেহেতু অফিস থাকে, এক শনিবারে মা আমাকে চার্চে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমিও কী মনে করে গেলাম সাথে। 'ভ্যালেন্তিনি মায়ের পর্ব' বা এই জাতীয় কিছু একটা ব্যাপার পালন করা হচ্ছিল সেদিন। যিশুর মা মারিয়ার বড় একটা মূর্তি এনে রাখা হয়েছে সামনে। সেই মূর্তির পায়ের কাছে কেউ কেউ ফল-টল এনে রাখছে। কয়েকটা অল্পবয়সী মেয়ে প্রত্যেকে একরকম শাড়ি পরে সেজেগুজে এসে হিন্দুদের মতো 'আরতি' দিতে লাগল। প্রত্যেকে হাতের থালায় জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে মূর্তির সামনে ঘোরাচ্ছে! প্রচণ্ড বিরক্তিতে আর এক মুহূর্ত সেখানে থাকার ইচ্ছা হলো না আমার। মূর্তিগুলো ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার ইচ্ছাটা অনেক কষ্টে দমন করতে হলো।

এরা না খ্রিষ্টান, না হিন্দু। হাস্যকর লাগছিল সবকিছু। অন্ধভক্তি সত্যিই অন্ধ করে দেয় মানুষকে।

দেখতে দেখতে আবারও নভেম্বরের দুই তারিখ এল। মৃতলোকের পর্ব। নানার কবরে যথারীতি সবাই মোম জ্বেলে প্রার্থনা করল। কবরে শায়িত একজন মৃতব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করছি—এই অদ্ভুত ব্যাপারটা নিয়ে কারও মনে কোনো চিন্তাই এল না। আমি এসব প্রার্থনার ধার ধারলাম না। জ্বলন্ত কবরগুলোর ছবি তোলায় বেশি মনোযোগী হলাম। রাতের আঁধারে কয়েকশ কবর অসংখ্য মোমের মৃদু আলোয় জ্বল জ্বল করছে—কী সুন্দর অপার্থিব একটা দৃশ্য!

১১.

খ্রিষ্টানদের মধ্যে অনেকগুলো denominations বা দল রয়েছে। এদের বিশ্বাসে, নিয়মে, রীতিনীতিতে রয়েছে অনেক পার্থক্য। স্কুলে আমার খ্রিষ্টান সহপাঠীদের মধ্যেও দেখেছিলাম ধর্ম পালনে ভিন্নতা। এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব একটা চিন্তা-ভাবনা করতাম না সে সময়। আমাদের দেশে প্রধানত দুই দলের খ্রিষ্টান রয়েছে—ক্যাথলিক আর ব্যাপটিস্ট।

ক্লাস নাইনের একটা মেয়েকে ওর বাসায় গিয়ে পড়াতাম। ওরা ছিল ব্যাপটিস্ট। ওদের চার্চ আলাদা। ওর কাছ থেকে শুনলাম সেখানে নাকি ক্যাথলিকদের মতো কোনো মূর্তি থাকে না, মুসলিমদের মাসজিদের মতো একদম খালি। ওর স্কুলের ধর্মশিক্ষা বইটি হাতে নিয়ে দেখলাম উল্টেপাল্টে। নতুন সংস্করণে দেখা গেল ব্যাপক সংস্কার করে ফেলা হয়েছে! মোশির কাছে দেওয়া ঈশ্বরের দশটা আজ্ঞা ক্যাথলিক আর ব্যাপটিস্টদের জন্য আলাদা করে ছক করে দেওয়া! যে যেটা মানে সে সেটা লিখবে পরীক্ষায়! তার মানে তারা একই ধর্মের হলেও নিজেরাই নিজেদের নিয়ম-কানুন নিয়ে বিভ্রান্ত।

Jehovah's Witnesses বা যিহোবার সাক্ষী নামের আরও একটা দল রয়েছে। তারা হঠাৎ হঠাৎ গির্জায় বা ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদের বাসায় এসে হাজির হয়। হাতে থাকে বাংলায় অনুবাদ করা উন্নতমানের পৃষ্ঠায় ছাপা আকর্ষণীয় রঙিন ছবিওয়ালা

পুস্তিকা, বই আর লিফলেট। ওরা খ্রিস্টানদের মতো পবিত্র ত্রিত্বে বা trinity কে বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন অথবা নরকের শাস্তি। নিজেদের দলে যোগ দেওয়ার আহবান জানাতে আসে ওরা। বিদেশি বক্তাদের নিয়ে বিভিন্ন সেমিনারের আয়োজন করে, সেখানে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। অনেক আগে থেকেই আগ্রহের সাথে পড়তাম ওদের দেওয়া বই, লিফলেটগুলো। ওরা ক্যাথলিকদের মতো যিশু অথবা মারিয়ার মূর্তিপূজা করে না, বড়দিন আর ইস্টার সানডে পালন করে না। পালন করে না কারও জন্মদিন। ওরা বলে খ্রিস্টধর্মে ওসব এসেছে পেগান বা মূর্তিপূজারিদের ধর্ম থেকে। শুনেছিলাম জাতীয় পতাকাকে স্যালুট করাকেও ঠিক মনে করে না এরা!

ক্যাথলিক বিশ্বাস ত্যাগ করে দুই-এক জন করে করে আমাদের এলাকার কেউ কেউ পুরো পরিবারসমেত ওদের দলে যোগ দিচ্ছিল। আমার খ্রিস্টান আত্মীয়দের কাছে যিহোবার সাক্ষীদের বিরুদ্ধে প্রায়ই শোনা যেত। তারা পছন্দ করতেন না তাদের এহেন স্রোতের বিপরীত চিন্তাধারা।

একদিন বাসার পুরোনো বই-খাতা আর কাগজ সব বিক্রির জন্য বাইরের বারান্দায় স্তূপ করে রেখেছিলাম। টিউশনি থেকে ফিরে দেখি বাবা কখন যেন সব কাগজওয়ালার কাছে বেঁচে দিয়েছেন। বই-খাতাগুলো যেখানে ছিল, সেখানে দেখলাম ছোট একটা পুস্তিকা পড়ে আছে। জানি না কেন ধুলো ঝেড়ে ওটা ভেতরে নিয়ে এলাম। ভেতরের পাতাগুলো জীর্ণ-মলিন। পানিতে ভিজে আবার শুকিয়ে গেলে কাগজ যেমন দেখায় তেমন হয়েছিল পাতাগুলো। পড়া শুরু করে দিলাম।

মার্টিং লুথার কিং নামের একজন মানুষের কথা লেখা। সে অনেক বছর আগে কোনো এক ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। সে সময় পোপের নির্দেশে সাধারণ মানুষের বাইবেল পড়া এবং নিজের কাছে রাখা নিষিদ্ধ ছিল। চার্চের দেওয়া এ রকম অদ্ভুত কিছু নিয়ম মেনে চলতে হতো সবাইকে। যেমন ‘পাপ বিক্রি’ নামের একটা প্রথা ছিল। সাধারণ লোকেরা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের পাপ বিক্রি করে পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারত। সেই ছেলেটি তার প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে হঠাৎ একটি বাইবেল খুঁজে পেল। বাইবেল পড়ে সে জানতে পারল ক্যাথলিক চার্চের বেশিরভাগ নিয়ম-কানুন ভিত্তিহীন, মানুষের তৈরি। বাইবেলে কোথাও লেখা নেই ওসব, বরং যা লেখা

আছে তা-ই মানা হয় না। ছেলেটি একাই সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। তার একমাত্র অস্ত্র ছিল বাইবেল।

যিহোবার সাক্ষীদের দেওয়া বই ছিল ওটা। তাদের কথাগুলো যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হতো আমার। তবে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারতাম না কেন যেন।

এর কিছুদিন পরে কারা যেন ছোট ছোট কিছু লিফলেট দিয়ে গেল বাসায়। একটাতে টেলিভিশনের কুফল সম্পর্কে লেখা। আরেকটাতে দাড়ি সম্পর্কে লেখা। যিশুর মতো দাড়ি রাখতে বলা হয়েছে যিশুর অনুসারীদের। এভাবে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে এককেটাতে একেক রকম ভালো ভালো কথা লেখা।

ধর্ম নিয়ে আগে কম বিভ্রান্ত ছিলাম না। এগুলো দেখে বিভ্রান্তি আরও বেড়ে যেতে লাগল। পুরোনো দিনগুলোর মতো ভাবতে শুরু করলাম আবারও—

কেন পৃথিবীতে এতগুলো ধর্ম?

কেন ধর্মের নামে মানুষে মানুষে শত্রুতা?

কেন একই ধর্মে এতগুলো দল? বিশ্বাসে পার্থক্য?

খ্রিস্টধর্ম বলে অন্য সব ধর্ম মিথ্যা। আবার যেহেতু আমি প্রমাণ পেয়েছি খ্রিস্টধর্ম মানুষের তৈরি, তাহলে সব ধর্মই মিথ্যা। আসলেই কি সব ধর্ম মানুষের তৈরি? মানুষকে পথ দেখানো জন্য কোনো একটি সত্যধর্ম থাকবে না? যদি থাকে তবে কোন ধর্ম সেটা?

আমি তো নিজের ধর্ম সম্পর্কেই এতদিন অজ্ঞ ছিলাম। অন্য ধর্ম সম্পর্কে তো বলতে গেলে কিছুই জানা নেই আমার। ইসলাম সম্পর্কে একটু আধটু জেনেছিলাম সেই ইসলামী কোর্সের মাধ্যমে। অবসর সময়টা তাহলে ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেই কাটানো যাক। কলেজের এক হিন্দু ছেলের কাছে ওদের ধর্মগ্রন্থ চেয়ে বসলাম।

এরপরের দিনগুলোতে একের পর এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যেতে লাগল। আর সেই সাথে শুরু হলো আমার জীবনযাত্রা, আমার চিন্তাধারার মোড় ঘুরে যাওয়ার পর্ব।

ছোটবোন একদিন ওর কলেজের এক সহপাঠীর সাথে ফোনে ওদের পরীক্ষার কী ব্যাপারে যেন আলোচনা করছিল। আমি এপাশ থেকে বোনকে বললাম ওকে জিজ্ঞেস করতে আমাকে পড়ার জন্য কোনো গল্পের বই দিতে পারবে কি না। ছেলেটি জানাল ওর কাছে আধ্যাত্মিক টাইপের বই আছে, চলবে কি না। বললাম যা আছে দিতে।

কিছুদিন পর বইটি হাতে পেলাম। পাকিস্তানি এক আলিমের লেখা উর্দু একটা বইয়ের বাংলা অনুবাদ। ভার্সিটিতে পড়া ইসলামী বইগুলো অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঠ্যবই হিসেবে পড়েছিলাম। আর এটা হলো আমার পড়া প্রথম ইসলামী বই যা আমি আগ্রহের সাথে পড়া শুরু করলাম। এই বই থেকেই আমি প্রথমবার স্পষ্টভাবে সৃষ্টিকর্তার ধারণা পেলাম। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহকে জানলাম। আল্লাহ হলেন এমন এক সত্তা, যার সাথে মানুষের সম্পর্ক মালিক আর দাসের। মানুষ শুধু তারই দাসত্ব করবে, আর কারও নয়।

সত্যিই তো। আমরা সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছার অধীন। আমরা শুধু তাঁর কাছে চাইব, আর তাঁর কাছ থেকেই পাব। নাওয়া-খাওয়া ভুলে পুরো বইটা একবারে পড়ে শেষ করে ফেললাম। এই বইটার একটা মজার ব্যাপার হলো প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষ শব্দ দিয়ে মিলিয়ে পরের অধ্যায় শুরু।

তার কিছুদিন পরেই ভার্সিটিতে নতুন সেমেস্টারের ক্লাস শুরু হলো। আবার ক্লাসে যাওয়া-আসা শুরু করলাম আমি। তখন ছিল রমাদান মাস। কিছু মেয়েকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছিল দেখতে। পরে বুঝতে পারলাম এরা রোযা রেখেছে বলে মেকআপ দেয়নি মুখে—তাই অন্যরকম দেখাচ্ছে। কেন জানি শুধু এই মাসেই এরা ধার্মিক হয়ে যায়। শুধু আযান দিলে মাথায় ওড়না দেওয়ার মতো অনেক মেয়েকে দেখেছি শুধু এই মাসে মাথা ঢেকে রাখতে, তবে তারা শুধু মাথাটাই কোনো রকমে ঢাকে, চুল না। অথচ শুনেছি মুসলিম মেয়েদের নাকি চুলও ঢেকে রাখতে হয়।

ক্লাসে কয়েকজন লোক এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন ওপর তলার বড় একটা ক্লাস রুমে। কোনো একটা টিভি চ্যানেল থেকে এখানে একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে—‘প্রশ্ন-উত্তরে রমাদান’। আমি অনেকদিন পর ক্লাসে আসাতে

আগে থেকে কিছুই জানতাম না। দেখলাম অন্য ক্লাস থেকেও ছাত্র-ছাত্রী ধরে আনা হয়েছে সেখানে। মেয়েদের বলা হলো মাথায় ওড়না দিতে। আমিও দিলাম। আমাদের বসতে দেওয়া হলো। সামনে মেহেদি-রাঙা লম্বা লম্বা দাড়িওয়ালা কয়েকজন হুজুর বসে আছেন। আমরা রমাদান সম্পর্কিত প্রশ্ন করব, তারা উত্তর দেবেন। বেশ মজা পেলাম। আমি যে মুসলিম না এরা বুঝতে পারেনি। যারা জানে তারাও বলে দেয়নি।

সপ্তাহে একদিন করে পর পর তিন সপ্তাহ এই প্রোগ্রাম *ইসলামিক টিভি*-তে দেখানো হয়েছিল। ভাগ্যিস আমার বাসার লোকজন ভুলেও এই চ্যানেল দেখে না।

সেই সেমেস্টারে Comparative Religion নিয়ে একটা কোর্স ছিল। ইসলামকে আরও নতুন আঙ্গিকে জানার সুযোগ হলো সেই কোর্সের মাধ্যমে। জানলাম ইসলামে নারীঅধিকার অন্যান্য ধর্মের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। একমাত্র এই ধর্মেই নারীদের সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করা হয়, সবচেয়ে বেশি অধিকার দেওয়া হয়, দেওয়া হয় সবচেয়ে বেশি মর্যাদা। অন্যান্য ধর্মে মানুষ যুগে যুগে নিজেদের প্রয়োজনে বদলে নিয়েছে নিজেদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ। ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা যেখানে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নিজে যে বিধান দিয়েছেন তা-ই মানা হয়। কুরআন এমন একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা আজ পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। ইসলামের বেশ কিছু প্রচলিত-অপ্রচলিত ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হয়েছিলাম এই কোর্সটি করে।

প্রচুর প্রশ্ন করতাম ক্লাসে। কত্ত কিছু জানার আছে! সেই স্যার ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যার লম্বা দাড়ি থাকা সত্ত্বেও দেখতে খারাপ লাগেনি। তার চেহারায় যেন একটা নূর ছিল, কথাবার্তা সবকিছুতে আমার দেখা হুজুর টাইপের মানুষদের চেয়ে আলাদা। তিনি জানতেন না যে আমি একজন অমুসলিম। তারপরও ধৈর্যের সাথে প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিতেন। তবে বন্ধুরা ততদিনে জেনে গেছে ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহের কথা। তারা নিজেদের জীবনে ইসলাম খুব একটা না মানলেও আমাকে সাহায্য করার জন্য অনেকেই আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে এসেছিল। বেশ কয়েকটা ইসলামী বই গিফট পেয়েছিলাম। বাসায় দেখলে সমস্যা হতে পারে বলে বইগুলোতে মলাট লাগিয়ে নিয়েছিলাম।

তখনও কিন্তু মনের মাঝে কোথায় যেন খচখচানি রয়ে গিয়েছিল একটা। ইসলামকে সত্যধর্ম হিসেবে মানতে চাইছিল না মন। ইসলাম বিষয়ক যা কিছুই

পড়তাম, সেখানে ভুল খুঁজে বেড়াতাম। বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি দিয়ে যা প্রমাণ করা যায় না, তা অন্ধের মতো অনুসরণ করার মানুষ আমি নই। যেই জায়গায় খটকা লাগত সেই বিষয়টা নিয়ে আরও ঘাঁটাঘাঁটি করতাম, যেভাবে পারি জানার চেষ্টা করতে লাগলাম। এভাবে জানতে গিয়ে কখন যে এই দ্বীনের রাজ্যে প্রবেশ করে ফেললাম নিজেরও জানা নেই।

দ্বীন! আমি জানলাম অন্যান্য মানুষের তৈরি ধর্মগুলোর মতো ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; পরিপূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা—যাকে দ্বীন বলা হয়। মানুষের ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনসহ সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা সম্বলিত জীবনব্যবস্থা। খ্রিস্টবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এগুলোও দ্বীন–তবে এগুলো পরিপূর্ণ নয়। কোথাও আছে কিছু ধর্মীয় বিধান, কোথাও আছে অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামো।

একজন কুরআনের অর্থের বাংলা অনুবাদ দিল। সেটা ছিল তখন পর্যন্ত আমার জীবনের সবচাইতে সেরা উপহার। কুরআনের একেকটা অধ্যায়কে বলা হয় সূরাহ, আর সূরাহ তে একেকটি স্তবককে বলা হয় আয়াহ। বিস্ময়ের পর বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। শুরুতে সূরাহ আল ফাতিহার পর কুরআনের সবচাইতে বড় সূরাহ 'আল বাকারাহ্' পড়ছি আর মনে হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ আমার সাথে কথা বলছেন। আল্লাহ—আমার সৃষ্টিকর্তা! তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করেই যেন প্রত্যেকটা কথা বলছেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো পড়ে যেতে লাগলাম। বাইবেলে পড়া প্রফেটদের কাহিনি খুঁজে খুঁজে পড়ছিলাম। আদম, নুহ, ইব্রাহীম, ইউসুফ, মুসা, ঈসা... এখানে সব কাহিনি সত্য বলে মনে হচ্ছিল। অথচ আগে এসব কাহিনি শুধু গল্প বলে মনে হতো। বিশ্বাস করতাম, আবার করতাম না। কুরআনে যিশুর মা মারিয়ার নামে পুরো একটা অধ্যায় আছে। খ্রিস্টানদের চাইতে অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাকে। যিশু বা ঈসা সম্পর্কিত আয়াতগুলো কুরআনে অনেক বেশি যৌক্তিক মনে হচ্ছিল।

আল্লাহ যুগে যুগে প্রত্যেক পথভ্রষ্ট জাতির কাছে বার্তাবাহক হিসেবে পাঠিয়েছিলেন নবী-রসুলদের। সেই একই নবীদের কাহিনি বিভিন্নভাবে বিকৃত হয়ে, কখনো অন্য ধর্মের সাথে মিশ্রিত হয়ে ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে যোগ হয়েছে। খ্রিস্টধর্মই যদি সত্য হতো তাহলে তাদের ধর্মগ্রন্থের এতগুলো ভার্সান থাকত না। মূল বাইবেল তো বহু

আগেই বিলুপ্ত, এখন যা আছে তা সব অনুবাদ। অথচ কুরআন এমন এক মহাগ্রন্থ যা মানুষের কাছে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ মুখস্থ করে নিজেদের মাথায় রেখে দিয়েছে। কুরআন পড়ার পর অন্তরে অদ্ভুত এক প্রশান্তি এসে ভর করল। এটা এমন এক অনুভূতি যে তা অনুভব করেনি সে কখনোই বুঝবে না।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললাম। আমাকে মুসলিম হতে হবে। যে পড়ালেখা বন্ধের উপক্রম হওয়ায় একসময় মরে যেতে ইচ্ছা করত—সেই জাগতিক পড়াশোনা নিয়ে কোনো আগ্রহই আর রইল না। কী হবে ওসব পড়ে। আমার জীবনের আসল উদ্দেশ্য আমি খুঁজে পেয়েছি। আমাকে ইসলাম নিয়ে পড়তে হবে। আরও জানতে হবে, আরও অনেক কিছু।

ইসলামী বই কোথায় কিনতে পাওয়া যায় আমার জানা ছিল না। টিউশনি থেকে ফেরার পথে ফার্মগেটের ফুটপাথে দেখলাম এক লোক কুরআন-হাদীসের বই বিক্রি করছে। ছাত্রী পড়ানোর বেতন পেয়ে সেখান থেকে কিনে ফেললাম বুখারী শরীফ নামের মোটাসোটা একটা হাদীসের বই। হাদীস হলো মুহাম্মাদের কথা। তিনি যা বলেছেন, যা করেছেন, করতে বলেছেন বা নিষেধ করেছেন সবকিছুই রয়েছে হাদীসের বইতে। ক্লাসে স্যার বলেছিলেন বুখারীতে মুহাম্মাদের কথাগুলো অনেক যাচাই বাছাই করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অন্যান্য হাদীসের তুলনায় সবচাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য।

বুখারী পড়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। ইসলামী জ্ঞানের ভান্ডার এত বিশাল এত বিস্তৃত যে এক জীবনে পড়ে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব না। শুধু বুখারী পড়েই মনে হয়েছে আমি এতদিন চোখ থাকতেও কতটা অন্ধ ছিলাম। ইসলাম এত সুন্দর, এত সুসংগঠিত একটা জীবনব্যবস্থা—ইসলাম নিয়ে নিজে পড়াশোনা না করলে তা কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয়। জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে কী করণীয় কী করণীয় নয়—প্রতিটা বিষয়ে কিছু না-কিছু বলা আছে। কোনো কোনো হাদীস পড়ে বিভ্রান্ত যে হইনি তা না। যেমন মিরাজের ঘটনা বিশ্বাস হতে চাইছিল না প্রথমে। কিন্তু আল্লাহ চাইলে কী না সম্ভব!

ততদিনে আমি প্রায় নিশ্চিত যে এই সেমেস্টারেও আমার পরীক্ষা দেওয়া হবে না। ক্লাসে নিয়মিত যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। ক্লাসের পড়াও আর করা হয় না। বাসায়

ক্লাসে যাওয়ার নাম করে বের হই, লাইব্রেরি বা অন্য কোথাও বসে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করি। তাফহিমুল কুরআন নামের একটা সিরিজ আছে যেখানে কুরআনের অর্থের ব্যাখ্যা, আল্লাহ কখন কোথায় কোন কথাটা কেন বলেছেন সব বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া। একে তাফসীর বলা হয়। কুরআনের প্রথম দিকের বড় বড় সূরাহগুলোর তাফসীর পড়ে ফেললাম, সূরাহ আল-ইমরান থেকে সূরাহ ইউসুফ পর্যন্ত। ড. মরিস বুকাইলির লেখা একটা ইন্টেরেস্টিং বই পেলাম—*বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান*। সেই বই পড়ে জানলাম বাইবেল বিজ্ঞানের সাথে কতটা সাংঘর্ষিক, ঐতিহাসিক ভুল তথ্য আর পরস্পর অসামঞ্জস্যতায় ভরা বাইবেলের সাথে কুরআনের তুলনা করে লেখক প্রমাণ করেছেন কুরআন সত্যই সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল ও প্রজ্ঞাময় এক মহাগ্রন্থ।

বাসায় তখন প্রায় সারাদিন আমি একাই থাকি। অজ্ঞতার দিনগুলোতে যেই আমি টিভির চ্যানেল বদলানোর সময় ইসলামী চ্যানেলগুলো বিরক্তির সাথে হাইড করে রাখতাম, সেই আমি ইসলাম শেখার জন্য বিভিন্ন বইপত্র পড়া ছাড়া বাকি সময়টুকু Peace TV দেখে ব্যয় করতে লাগলাম। আমার কাছে পীস টিভি ছিল স্বর্ণের খনির মতো। এখানে আমার নতুন শিক্ষকদের সাথে যেন নতুন পাওয়া জ্ঞানের সাগরে সাঁতার কাটতে লাগলাম। জাকির নায়েকের লেকচারগুলো যেন আমার জন্যই দেখানো হচ্ছে। ইয়াসির ক্বাযাগার লেকচার শুনে চোখে পানি চলে আসত। হুসেইন ইয়ের কাছ থেকে শিখেছি অনেক নিয়ম-কানুন, জেনেছি অনেক না-জানা ফাতওয়া। নিয়মিত দেখতাম ইসমাইল মেনকের Youth Talk। ইউসুফ এস্টেস বাচ্চাদের নিয়ে Stories of the Prophets এ যেন আমাকেই শোনাচ্ছেন নবী-রসুলদের কাহিনি। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম কখন বাসার সবাই যার যার কাজে বের হয়ে যাবে আর আমি টিভি খুলে আমার নতুন স্কুলে ক্লাস করব। খাতা-কলম নিয়ে নোট করতাম নিয়মিত।

ডা. জাকির নায়েকের লেকচার থেকে জানলাম বাইবেলে আছে শূকরের মাংস খাওয়া নিষেধ[১৫], মদ্যপান নিষেধ[১৬], প্রার্থনার সময় মেয়েদের মাথা ঢেকে রাখতে

---

১৫ শূকর সেই ধরনের, সুতরাং তারা তোমাদের পক্ষে অশুচি। ওইসব প্রাণীর মাংস খাবে না। এমনকি তাদের মৃতদেহও স্পর্শ করবে না, তা তোমাদের পক্ষে অশুচি। [লেবীয় পুস্তক ১১:৭-৮]

১৬ দ্রাক্ষারস নিন্দক; সুরা কলহকারিণী; যে তাহাতে ভ্রান্ত হয়, সে জ্ঞানবান নয় [হিতোপদেশ ২০:১]

হয়[১৭], মূর্তি বা প্রতিমাপূজা নিষেধ[১৮], বাইবেলে কোথাও trinity বা ত্রিত্বের কথা বলা নেই—এ রকম আরও কিছু বিষয়। প্রত্যেকটা রেফারেন্স নোট করে রাখলাম। বাইবেলে সেগুলো খুঁজে বের করলাম। মাকে দেখালাম। মা বললেন নানিকে দেখাতে, তার কাছে জানতে চাইতে। নানিকে বলার পর নানি বললেন মামিকে দেখাতে, হয়তো তিনি বলতে পারবেন কেন বাইবেলে থাকার পরেও আমরা এসব নিষেধাজ্ঞা মানি না।

মামিকে বাইবেল খুলে প্রত্যেকটা রেফারেন্স পড়ে শোনানোর পর তিনি বললেন, আমরা বাইবেলের পুরাতন নিয়ম মানি না। আমরা খ্রিস্টের অনুসারী খ্রিস্টানরা শুধু 'নতুন নিয়ম' মানি। অথচ নতুন নিয়ম বা new testament এ কিন্তু যিশু নিজেই বলেছেন তিনি আগের নিয়ম পরিবর্তন করতে আসেননি[১৯]। আর নতুন নিয়মেও এই নিষেধগুলো আছে। নতুন নিয়মের কোথাও ত্রিত্বের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি—এই ব্যাপারটা বরাবরই বড় বিভ্রান্তিকর মনে হতো। তিনিও পারলেন না উত্তর দিতে। আমাকে বললেন চার্চের ধর্মযাজকের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতে।

১৩.

'মানুষ কি মনে করে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?'[২০]

আমার জীবনেও একের পর এক ঈমানের পরীক্ষা আসতে লাগল। তবে শুরুটা ছিল ছোটখাটো পরীক্ষার মাধ্যমে।

মা ততদিনে সন্দেহ করা শুরু করে দিয়েছেন। আসলে মায়েরা কীভাবে যেন টের পেয়ে যান সবকিছু। আমার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন দেখেই হয়তো আমার ওপর কড়া

---

১৭ স্ত্রীলোক যদি তার মাথা না ঢাকে তবে তার চুল কেটে ফেলাই উচিত। কিন্তু চুল কেটে ফেলা বা মাথা নেড়া করা যদি স্ত্রীলোকের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়, তবে সে তার মাথা ঢেকে রাখুক। [করিন্থিয় ৬:১৪-১৭]

১৮ আমার প্রিয় বন্ধুরা, সব রকম প্রতিমাপূজা থেকে দূরে থাকো। [করিন্থিয় ১০:১৪]; তাই স্নেহের সন্তানরা, তোমরা মিথ্যা দেবদেবীর কাছ থেকে দূরে থেকো। [যোহন ৫:২১]

১৯ ভেবো না যে আমি মোশির বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের শিক্ষা ধ্বংস করতে এসেছি। আমি তা ধ্বংস করতে আসিনি বরং তা পূর্ণ করতেই এসেছি। [মথি ৫:১৭]

২০ সূরাহ আনকাবুত, ২৯:২

নজর রাখা শুরু হলো। একই বিল্ডিং এ থাকা সত্ত্বেও নানি-মামা-খালাদের বাসায় যাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছি। পশ্চিমা পোশাক বাদ দিয়ে বাসাতেও বড় ওড়নাসমেত সালোয়ার-কামিজ পরা শুরু করেছি। ইসলামের নিয়ম অনুযায়ী পর্দা করতে পারছি না বলে যতটুকু সম্ভব নিজেকে অনাকর্ষণীয় করে রাখার চেষ্টা করতাম। বাইরে বের হতে হলে ফুলহাতা জামা-পাজামার নিচে আরেক জোড়া জামা-পাজামা পরতাম। বোরখা পরতে পারছি না বলে এই ব্যবস্থা—যাতে ভেতরের কাপড়টা না দেখা যায়। পার্টিতে গেলে চুপচাপ আলাদা বসে থাকি। সাজগোজ করি না, ভ্রু প্লাক করাই না, এমনকি কানে দুলও পরি না। গান শুনি না। ছেলেদের সাথে কথা বলি না। এসব কিছু দেখে আত্মীয়-স্বজন বলাবলি করতে লাগল আমি কারও প্রেমে পড়েছি। সে পছন্দ করে না বলেই আমি এভাবে চলি। দুই একজন সরাসরি জিজ্ঞেসও করে ফেলল আমাকে। আমি যতই বলি না, তারা ততই অবিশ্বাস করেন। শেষে আমাকে পথে ফেরাতে তারা উদ্যোগ নিলেন—আমার বিয়ের জন্য পাত্র দেখা শুরু করে দিলেন।

আমি আবার এর মাঝে ছোটখাটো একটি বোকার মতো কাজ করে ফেললাম। মোবাইলের কলার টিউন ছিল Boulevard of broken dreams। একসময়ে পছন্দের গান ছিল। হঠাৎ করেই কানে যেন বিকট লাগতে থাকল গানটা। ওটার বদলে কলার টিউন বেছে নিলাম Give thanks to Allah। মা এই গান শুনে ভীষণ খেপে গেলেন। সন্দেহ আরও বেড়ে গেল।

আমার মা একজন 'আধুনিক মুক্তমনা' মহিলা। তিনি মুসলিমদের—বিশেষ করে ইসলাম পালনকারী মুসলিমদের পছন্দ করতেন না। ঠিক যেমন আমি আগে করতাম না; ঠিক যেমন সেকুলার মুসলিমরা করে না। কোনো মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করতে চাই বলে আমি মুসলিম হতে চাইছি এমন একটা ধারণা জন্ম নিল তার মনে। আমাকে আদর করে, বকা দিয়ে, অভিমান করে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। ইসলামের পক্ষে কোনো কথা বললেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন যেন। ভয়ে আর কথা বাড়াতাম না। সে সময় মায়ের সাথে বেশ একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল আমার। তুচ্ছ আর হাস্যকর একেকটা কারণে খারাপ ব্যবহার করতে লাগলেন তিনি। কখনো জোর করে আমাকে গির্জায় নিয়ে যেতেন। একবার এক অনুষ্ঠানে লিপস্টিক লাগাইনি বলে বকা খেলাম। এমন কি টিভিতে নাচের রিয়ালিটি শো দেখি না বলেও কথা শুনতে হয়েছিল। এক আত্মীয়া বলেছিলেন, আমি নাকি গার্মেন্টসের

মেয়েদের মতো ক্ষ্যাত হয়ে গিয়েছি! আগের সব জামা বাতিল করে দিয়ে সাধারণ সুতির ফুল স্লিভ জামা পরি দেখে আমাকে 'হাজিসাব' বলেও ডাকা শুরু হয়েছিল।

একদিন নানির বাসায় কিছু আত্মীয়দের সাথে আলাপ হচ্ছিল যে ২৫শে ডিসেম্বর যাকে বড়দিন হিসেবে পালন করা হয়, আসলে যিশুর জন্মদিন নয়,[২১] বরং পৌত্তলিক সূর্যপূজার একটি উৎসবের দিন। আত্মীয়রা চলে যাবার পরে অপদস্থ হতে হয়েছিল সেদিন। পরোক্ষভাবে অনেক কথা শোনানো হলো।

ছোটবোনের সাথে আমার বয়সের পার্থক্য কম হওয়াতে পরস্পরের বান্ধবীর মতো ছিলাম আমরা। প্রায় সবকিছুই শেয়ার করতাম একে অপরের সাথে। আর দশটা খ্রিষ্টানের মতো ছোটবেলা থেকে আমার নাম ধরে ডাকলেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে ও আমাকে। সব সময় যেকোনো ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত বা পরামর্শ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে নেয়। ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম ইসলামই আসলে একমাত্র সত্য ধর্ম। বাকি সব ধর্ম মিথ্যা। বাইবেল পড়তে দেখেছিল ও আমাকে। ড্যান ব্রাউনের বইগুলো পড়ার সময়ও আলোচনা করতাম ওর সাথে। জানি না ওর মনে কী আছে, বলে দেবে কি না সবাইকে—তাই সতর্কতার সাথে আমার জ্ঞানের উৎস উল্লেখ না করে সংক্ষেপে ওর কাছে বর্ণনা করলাম। একসময় দেখা গেল ও নিজেও ইসলামের প্রতি আগ্রহ পোষণ করতে লাগল। ভাইকেও বলেছিলাম একটু-আধটু। একদিন ও মাকে বলে দিল আমি টিভিতে ইসলামী চ্যানেল দেখি। তারপর আমার ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেল, টিভি দেখার কথা বাধ্য হয়েই অস্বীকার করতে হলো। পরের দিন আবিষ্কার করলাম Peace TV লুকিয়ে ফেলা হয়েছে। কী আর করা। প্রতিদিন বাসায় কেউ না থাকলে আনহাইড করে পীস টিভি দেখতাম। দেখা শেষে আবার হাইড করে ফেলতাম।

এক বিকেলে ছোটবোনকে সাথে নিয়ে মামার বাসায় গিয়েছি। আমাদের নুডলস খেতে দিলেন মামি। নুডলসে মাংস দেখে জানতে চাইলাম কিসের মাংস। মামি বললেন, রাশিয়ান দিয়েছি। আমাদের ওইদিকে শূকরের মাংসকে সরাসরি শূকরের মাংস বা পর্ক না বলে রাশিয়ান মিট বলা হয়। মহা বিপদে পড়ে গেলাম! খেতেও

---

21 Biblical Evidence Shows Jesus Christ Wasn't Born on Dec. 25. (n.d.). Retrieved March 14, 2016, from http://www.ucg.org/the-good-news/biblical-evidence-shows-jesus-christ-wasnt-born-on-dec-25

পারছি না, আবার ফেলতেও পারছি না। সবাই জানে এই মাংস আমি খুব পছন্দ করি। তাই কিছু না বলে রাশিয়ান বেছে নুডলস খেয়ে নিলাম। পরে কিচেনে গিয়ে কাউকে না দেখিয়ে মাংসের টুকরোগুলো আস্তে করে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম।

একদিন তিনতলায় গিয়ে নানির বিছানায় লেমিনেট করা একটা কাগজ দেখতে পেলাম। ইংরেজিতে লেখা Saint Anthony এর কাছে করার জন্য বিশেষ প্রার্থনা। নানি নাকি প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে ওটা পড়ে নেন। হিন্দুরা যেমন দেবতার কাছে চায়, আমার নানি সেরকম বিভিন্ন সাধু আর সাধ্বীর কাছে প্রার্থনা করেন। এদের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। তিনি বলেন, কিছু হারিয়ে গেলে অমুকের কাছে; কষ্ট দূর করার জন্য অমুকের কাছে; পাপের ক্ষমার জন্য তমুকের কাছে চাইতে হয়। আমি বললাম সরাসরি সৃষ্টিকর্তার কাছে চাইলেই তো হয়ে যায়। উত্তরে তিনি বলেন, এরা হলেন সুপারিশকারী। আমাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে এরা সুপারিশ করেন। কথাটা শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল কুরআনের সেই আয়াতের কথা যেখানে আল্লাহ বলেছেন:

> আর তোমরা সে দিনকে ভয় করো, যেদিন কেউ কারও কোনো কাজে আসবে না। আর কারও পক্ষ থেকে কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারও কাছ থেকে কোনো বিনিময় নেওয়া হবে না। আর তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবেনা।[২২]

সুপারিশের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিটা ভারসাম্যপূর্ণ। সুপারিশের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে এবং যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন, সে-ই তার জন্য সুপারিশ করতে পারবে। কারও কাছে সুপারিশ চাওয়া তাই শির্ক।

১৪.

পুরোপুরি মুসলিম হতে হলে আমাকে সলাত পড়া শিখতে হবে। ভার্সিটির বন্ধুরা তখন মিডটার্ম নিয়ে ব্যস্ত। পরিচিত বিশ্বাসযোগ্য কয়েকজনকে বললাম সলাতে আরবীতে কী কী বলতে হয় আমাকে যেন বাংলায় লিখে দেয়। বাকিটা আমি নিজে

---

২২ সূরাহ আল-বাকারা, ২:৪৮

কারও কাছ থেকে শিখে নেব। সময় হয়নি কারও। হয়তো কারও মাথায় আসেনি আমার মতো একজন ধর্মহীন মেয়ে সত্যি সত্যি মুসলিম হতে চাইছি। সলাত সম্পর্কে তখন আমার তেমন ধারণাই ছিল না। তাই বুঝতে পারিনি এভাবে লেখা পড়ে পড়ে সলাত শেখা অসম্ভব। তারপর যে ঘটনাগুলো ঘটতে লাগল তাকে মিরাকল না বলে আর কী বলা যায় জানি না।

কী কাজে যেন একদিন তিনতলায় নানির বাসায় গেলাম। নানিদের ফ্লোরে পুরো ইউনিট নিয়ে তারা থাকেন। বড়মামা সপরিবারে দোতালায় শিফট হয়ে যাওয়ার পর আর মেজোমামা মারা যাওয়াতে দুই-তিনটা ঘর খালি পড়ে থাকে। তেমনই এক শূন্য ঘরে চোখে পড়ল ক্লাস ফোরের একটা বই। ইসলাম ধর্ম শিক্ষা! এই বই কোত্থেকে কী করে এই বাসায় আসলো সেটা বিরাট এক রহস্য। কাউকে কিছু না বলে মহানন্দে বাসায় নিয়ে এলাম বইটি। সলাতে পড়ার জন্য ছোট ছোট সূরাহ বাংলায় উচ্চারণসহ লেখা। আরবী হরফ, আলিফ-বা-তা লেখা। খুশিতে কান্না পেল আমার। বার বার পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেললাম।

কিছুদিন পরে পুরোনো এক বান্ধবীর কাছ থেকে একটা বই পেলাম। সেখান থেকে বহু কষ্টে চেষ্টা করতে লাগলাম সলাতের পুরো প্রক্রিয়াটা আয়ত্ব করতে। রাকাতের ব্যাপারটা বুঝতে খুব কষ্ট হয়েছিল। খাতায় ছক এঁকে-লিখে বিভিন্নভাবে বোঝার চেষ্টা করলাম। শেষে নিজে যা বুঝলাম সেভাবেই শিখে নিলাম। মুখস্থ করলাম সানা, তাশাহহুদ, দরুদ আর দুআ মাসূরা। প্রত্যেকটির বাংলা অর্থ মনে রাখার চেষ্টা করতাম।

বাসায় সেদিন কেউ ছিল না। দরজা-জানালা বন্ধ করে শুরু করলাম সলাত পড়া। জীবনের প্রথম নামায। প্রথম সাজদাহর মুহূর্তটি সারাজীবন মনে থাকবে আমার। স্রষ্টার উদ্দেশে মাটিতে মাথা ঠেকানোর সাথে সাথে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলাম। সেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায়, যিনি আমাকে নিজ অনুগ্রহে একজন মুসলিমা হিসেবে সম্মান দান করেছেন।

সে সময় যতবার সলাতে তাশশাহুদ পড়তাম, ততবার রোমাঞ্চকর অনুভূতি হতো—

‘আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসুলুহ’

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর সত্য কোনো ইলাহ নেই, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

ছেলেবেলায় আযানের সময় শোনা সেই কথাগুলো—যা টিভিতে শুনে সাউন্ড বন্ধ করতে বলেছিলাম, যে কথাগুলো খেলতে খেলতে সুর করে গাইতাম।

শরীরের প্রত্যেকটা লোম খাড়া হয়ে যেত! সূরাহ পড়ার সময় প্রত্যেকটি আয়াতের অর্থ যতটুকু জানি, তা অন্তর দিয়ে অনুভব করতাম। সূরাহ ফাতিহাতে ‘মালিকি ইয়াওমিদ্দীন’ পড়তাম আর মনে হতো সেই ভয়াবহ দিনের কথা, যেদিন আমাদের পাপ-পুণ্যের বিচার হবে, আল্লাহ সে দিনের মালিক। সূরাহ ইখলাস পড়ার সময় আয়াতগুলো যেন নিজেকেই নিজে বলছি—আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, তাঁর কোনো সন্তান নেই—তিনি নিজেও কারও সন্তান নন।

সেই ছোটবেলা থেকে মাসজিদের আযান শুনে আসছি, অথচ এবার আযান শুনি আর অন্যরকম অনুভূতি হয়। অর্থ জানি বলেই হয়তো মনে হতো মুয়াজ্জিন আমাকে উদ্দেশ্য করেই বলছেন কথাগুলো।

‘হাইয়া আলাস সলাহ... হাইয়া আলাস সলাহ... হাইয়া আলাল ফালাহ... হাইয়া আলাল ফালাহ...

কানে গেলেই শিহরিত হতাম। একজন মানুষ দিনে পাঁচবার চিৎকার করে আল্লাহর এককত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সবাইকে সলাতের আহবান করছেন, কল্যাণের দিকে আহবান করছেন। তারপরও কারও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, অনায়াসে উপেক্ষা করে যে যার কাজে ব্যস্ত। নিজের সমস্ত সত্তা যেন বদলে গেল আমার। পুরোনো শরীরে এখন নতুন এক মানুষ আমি। দুনিয়াটাকে অন্য চোখে দেখতে লাগলাম। সন্ধ্যায় মাগরিবের সময় রাস্তায় লোকজন দেখলে মনে হতে লাগল এরা সব হিন্দু আর খ্রিস্টান নয়তো ধর্মহীন লোকজন।

মা চাকরীজীবি ছিলেন বলে দিনের বেলা নির্বিঘ্নে স্বাভাবিক নিয়মে সলাত পড়ে নিতে পারি। ছুটির দিনগুলোতে অথবা বাসায় কেউ থাকলে সমস্যা হয়ে যেত। তখন আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করা উচিত। পীস টিভিতে এক লেকচারে শুনেছিলাম বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইশারায় সলাত আদায় করা যায়। এটা শোনার পর থেকে সলাত পড়া বাদ না দিয়ে ইশারায় সলাত আদায় শুরু করলাম। ছোটবোন যেন বুঝতে না পারে তাই কখনো কখনো বিছানায় বসে সামনে একটা বই খোলা রেখে পড়তাম। ছোটবোন আমার বই পড়ার এই কায়দা দেখে মজা পেত।

একবার এভাবে ইশার সলাত পড়ার সময় মা এসে ঢুকলেন ঘরে। ভয়ে হার্টবিট বেড়ে গেল আমার। শেষের দিকে ছিলাম বলে সলাত না ভেঙে পুরোটা পড়ে নিলাম। আমাকে উদ্দেশ্য করে কী কী যেন বলছিলেন তিনি। খেয়াল করে শুনিনি। সলাত শেষে শুনি মা ভুরু কুঁচকে জানতে চাইছেন আমি কি নামায[২৩] পড়ছিলাম কি না। আশ্চর্য ব্যাপার! হঠাৎ কেন তিনি সরাসরি সলাতের কথা জিজ্ঞেস করলেন। কী করে বুঝলেন তিনি! এতটাই অবাক হয়েছিলাম যে উত্তর দিতে পারিনি।

একবার আসরের সলাত আদায় করার জন্য ওযু করতে গিয়ে ওয়াশরুম ফাঁকা পেলাম না। সবার দৃষ্টির অগোচরে ওযু করার একটাই উপায় খুঁজে পেলাম। কিচেনে তখন কেউ ছিল না। বইতে পড়েছি পশ্চিম দিকে মুখ করে ওযু করতে হয়। কিচেনের সিংকটা ছিল পূর্বদিকে। বিভিন্নভাবে কায়দা কসরত করে পশ্চিমদিকে ফিরে পূর্বদিকে ওযু করেছিলাম। পড়ে জেনেছি পশ্চিমদিকে মুখ করে ওযু করার কোনো নিয়ম নেই—শুধু সলাত আদায় করতে হয় পশ্চিম দিকে ফিরে।

এ ধরনের বহু মনগড়া নিয়ম রয়েছে আমাদের দেশে প্রকাশিত অধিকাংশ ইসলামী বইগুলোতে। আমাদের স্কুলে ইসলাম বলতে বুঝতাম মিলাদের একটা অনুষ্ঠান; অথচ পরে জেনেছি মিলাদের সাথে মৌলিক ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। হিজরি ষষ্ঠ শতাব্দীতে কিছু বিভ্রান্ত মানুষের আবিষ্কৃত একটি রেওয়াজ, যা পুণ্যের উদ্দেশ্যে করা হলেও সওয়াব তো হয়ই না বরং পাপ হয়। ইসলামে এ ধরনের নব আবিষ্কৃত রীতিগুলোকে বিদআত বলে। খ্রিস্টানরা যে যিশুর জন্মদিন পালন করে সেটা মিলাদ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মিলাদ মানে জন্মদিন। বিদআত খুব ভয়াবহ জিনিস। ঈসা

২৩ আমাদের দেশে সাধারণত সলাতকে বলা হয় নামায। নামায শব্দটির চেয়ে সলাত শব্দটি উত্তম কারণ এটি ইসলামী পরিভাষা। নামায ছিল প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীদের একটি উপাসনা পদ্ধতি। - সম্পাদক।

আলাইহিস সালামের করা আসল ইবাদাতগুলো হারিয়ে গেছেই ধর্মের নামে মানুষের আবিষ্কৃত আচার-আচরণগুলো পালন করতে যেয়ে। একারণেই ইসলামে প্রতিটি বিদআতকে পথভ্রষ্টতা বলে নিন্দা করা হয়েছে।[২৪]

আরেকবার ঠিক মাগরিবের সলাতের সময় মা অফিস থেকে ফিরলেন। সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ সলাত আদায়ের সুযোগ পাচ্ছি না। ছাদে কাপড় শুকাতে দেওয়া হয়েছিল। সেই কাপড় নিয়ে আসার অযুহাতে তাড়াতাড়ি ওযু করে ছাদে চলে গেলাম। ছাদে গিয়ে আবছা অন্ধকারে এক কোনায় দাঁড়িয়ে কোনোরকমে পড়ে নিলাম। আশেপাশের বাড়ি থেকে কেউ দেখে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যেত। সবাই জানে এ বাড়িতে মুসলিম কেউ থাকে না। নিয়মিত সলাত পড়ে, ওয়াক্ত হয়ে গেলে ছাদে গিয়ে পড়বে—এমন মুসলিমদের সাথেও এদের সখ্য থাকার কথা না।

একদিন মা জানালেন এবার যেভাবে হোক তিনি সেমেস্টার ফি যোগাড় করে দেবেন, আমি যেন কোনো চিন্তা না করি। তারপরও মনে মনে ঠিকই সন্দেহ ছিল তার। কথায় কথায় রেগে যেতেন আর বলতেন আমি মুসলিম হতে চাইলে তিনি আত্মহত্যা করে ফেলবেন। আবার কখনো বলতেন যে আমাকে বাসা থেকে বের করে দেবেন। বিশ্বাসঘাতক মেয়ে থাকার চাইতে না থাকাই ভালো। আমি আমার মাকে বেশ ভয় পেতাম। আর তিনি আমাকে ভয়াবহ রকমের মানসিক অত্যাচার করতেন। কষ্টটা কেমন তা অন্য কাউকে বোঝানো যাবে না। তারপরেও আমি তখন দুআ করতাম, এখনো দুআ করি—আমার মাকে আল্লাহ যেন হিদায়াত করেন এবং একজন মুসলিম হিসেবে কবুল করেন।

এ দেশের খ্রিস্টানদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল বলেই হয়তো তাদের আচার-আচরণ, প্রথা, ধর্মীয় কাজকর্মে সনাতন ধর্মের প্রভাব বেশ লক্ষণীয়। পশ্চিমা রীতি আর হিন্দু রীতি রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর নিজস্ব রীতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে এ দেশের খ্রিস্টানদের মাঝে। নানির বাড়ির লোকজনের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিল না। তবে দীর্ঘদিন ওই খ্রিস্টানপাড়ায় বসবাসের দরুন তারাও

২৪ আবু দাউদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২

কেউ কেউ অন্যান্য বাঙালি খ্রিস্টানদের অনুকরণে সেসব রীতি মেনে চলেন। কেউ বিপদে পড়লে হিন্দুদের দেবীকে ডাকার মতো করে যিশুর মা মারিয়াকে ডাকতে শুনেছি 'মাগো মা, দয়া করো' বলে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে মারিয়ার মূর্তি রয়েছে, এরা সেই মূর্তিকে সামনে রেখে প্রার্থনা করে।

সেই ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছি ধর্মীয় উৎসবের দিন, সম্মানিত কারও সাথে দেখা হলে অথবা অনেকদিন পর দেখা হলে বড়দের পা ছুঁয়ে 'প্রণাম' করে 'আশীর্বাদ' নিতে হয়। যদিও অনেকে পশ্চিমাদের মতো ডান হাত কপালে ছুঁইয়ে চুমু দিয়ে সম্ভাষণ জানায়। আমার পরিচিতজনদের মাঝে দেখতাম কেউ পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ না নিলে তাকে অহংকারী হিসেবে ধরা হতো।

ঈদের দিন বাবা যখন দাদির সাথে দেখা করতে নিয়ে যেতেন, তখন সেখানে উপস্থিত সবাইকে পা ছুঁয়ে 'সালাম' করতে শিখিয়ে দিয়েছিলেন বাবা-মা। বইতে পড়েছিলাম আমাদের দেশে নাকি একে কদমবুসি করা বলে। খ্রিস্টানদের মতোই এ প্রথা এ দেশের মুসলিমদের মাঝে এসেছে হিন্দুদের প্রণাম থেকে। একজন মুসলিম একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও সামনে সম্মান দেখিয়ে মাথা নত করে না। করলে সেটা ছোটখাটো একটা 'শির্ক' হয়ে যাবে। শির্ক হলো বান্দার যে সমস্ত কার্যকলাপ বা আচার-আচরণ শুধু আল্লাহর প্রাপ্য, যা শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত—এমন কোনো কিছুতে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অংশীদার করা। এটা জানার পর আমিও প্রণাম/সালাম/কদমবুসি এসব পুরোপুরি ছেড়ে দিলাম।

খ্রিষ্টমাস, নিউ ইয়ার, ইস্টার সানডে—প্রত্যেকবার আমরা সব খালাতো-মামাতো ভাই-বোনরা গির্জা থেকে ফিরে একে একে বড়দের সবার সাথে দেখা করে তাদের পা ছুঁয়ে সেই হাত কপালে ঠেকিয়ে চুমু খেতাম। 'ভালো মেয়ে' হিসেবে আমি আগে বেশ আগ্রহের সাথেই সবার আগে কাজটা সেরে নিতাম। এবারের উৎসবের দিনগুলোতে বাকিরা যখন সালাম করছিল, আমি আস্তে করে সরে এসেছিলাম। কেউ বুঝতেই পারেনি। নয়তো তা নিয়ে পরে নির্ঘাত কথা শুনতে হতো। আপাতদৃষ্টিতে খুব সামান্য ব্যাপার মনে হলেও আমার জন্য এটা অতি আশ্চর্যজনক ছিল যে কেমন করে কেউ বুঝতে পারল না তারা।

ঈদ-উল-আযহার দিন সাহস করে অনুমতি চাইলাম মায়ের কাছে আমার এক চাচার বাসায় বেড়াতে যাওয়ার জন্য। চাচাতো বোন দুইজন আমার আর আমার ছোট বোনের প্রায় সমবয়সী। জীবনে হাতে গোনা কয়েকবার ওদের সাথে দেখা হয়েছে দাদির বাড়িতে। তাও অনেক আগে স্কুলে পড়ার সময়ে। এই প্রথম ওদের বাসায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ছোটবোনের এক বান্ধবীর বাসায় দাওয়াত ছিল বলে ও যেতে পারবে না জানিয়ে দিল। তাই আমার ভাই আর খালাতো-মামাতো দুই বোনকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে চাচা-চাচির সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথে আমি ছাড়া বাকি সবাই তাদের পা ছুঁয়ে কদমবুসি করে ফেলল। অথচ ওরা সবাই খ্রিস্টান। আমি করলাম না দেখে খুব অবাক হলো ওরা। আর চাচারা কে কী ভেবেছেন আল্লাহ ভালো জানেন। আমার মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে কোনো ধারণা ছিল না তাদের।

১৬.

বাসায় একদিন পীস টিভি দেখছিলাম–Stories of the Prophets এর শেষ এপিসোড দেখাচ্ছে। আগের পর্বগুলোতে সব নবীদের গল্প বলা শেষ। আজ শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাহিনি শোনানো হবে। গভীর মনোযোগের সাথে দেখছি আমি। নবীর জন্য মনে শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা অনুভব করলাম। ইউসুফ এস্টেস যখন সূরাহ ফাতিহা পড়ে শোনালেন বাচ্চাদের, মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। সলাতে এই সূরাহ কত হাস্যকরভাবে পড়ি আমি! কবে যে এভাবে শিখতে পারব! মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

মায়ের কথামতো আবারও ক্লাসে যাওয়া শুরু করলাম। ল্যাবে গিয়ে ইসলামী সাইট সার্চ দিয়ে পড়তাম। একদিন লাইব্রেরিতে বসে এক বান্ধবীর কাছে সূরাহ ফাতিহা শুনতে চাইলাম। কী যে সুন্দর করে তিলাওয়াত করল মেয়েটা! শুনে আবারও একবার বিমুগ্ধ হলাম। এত সুন্দর করে পড়া যায়! বার বার শুনতে চাচ্ছিলাম। আমি বাংলায় লেখা উচ্চারণ পড়ে পড়ে শিখেছি বলে অনেক ভুল উচ্চারণ করতাম। ওর কাছ থেকে শুনে নিজের মতো করে লিখে নিলাম একটা কাগজে।

সহপাঠীরা সবাই ততদিনে জেনে গেছে আমি ইসলাম পালন করছি। মাথায় ওড়না দেওয়াতে এক মেয়ে উপহাসের হাসি দিয়ে জানতে চাইল আমি মুসলিম হয়েছি বলেই কী মাথায় কাপড় দিচ্ছি কী না। ওরা পর্দা করা তো দূরের কথা, সলাতই আদায় করত না। সারাদিন বয়ফ্রেন্ড আর মেকআপ নিয়ে ব্যস্ত। ছেলেরাও কেউ কেউ উপহাস করত। যেমন আমাকে দেখে একজন ঠাট্টা করে বলেছিল, আসসালামু আলাইকুম, কাইফা হালুকা? আমি মুসলিম হবার পরে শুধু ইসলামের কারণে এইসব মুসলিমদের সাথে একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

শুনেছি ইসলামে আসার পর নাকি অনেক আত্মত্যাগ করতে হয়। এ পর্যন্ত আমার জীবনে যা কিছু বাদ দিয়েছি, জীবনে যে পরিবর্তনগুলো এনেছি তাকে আমি ঠিক আত্মত্যাগ বলতে পারি না। স্বেচ্ছায়, নিজের স্বার্থে, শান্তি লাভের প্রত্যাশায় সেসব ত্যাগ করেছি আমি। বরং সেই সব ত্যাগের মাধ্যমে অন্তরে যে প্রশান্তি লাভ করেছি তা সত্যিই অতুলনীয়।

বই পড়া আর ছবি আঁকা আমার নেশা ছিল। খুব ছোটবেলা থেকেই ভালো স্কেচ করতে পারতাম। যেকোনো আকারের, যেকোনো বস্তু দেখে দেখে হুবহু নকল করে ফেলতে পারতাম। ছবি আঁকাআঁকির সরঞ্জামের অভাব ছিল না। ছোটবেলায় পড়তে বসলে নিজের পায়ের ওপর কলম দিয়ে ছবি আঁকার অদ্ভুত একটা অভ্যাস ছিল। বড় হয়ে এই কাজ সরাসরি খাতার ওপর করতাম। প্রায় প্রত্যেকটা পৃষ্ঠায় মানুষের মুখের বিভিন্ন অভিব্যক্তির স্কেচ আঁকা থাকত। পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক হয়ে এঁকে ফেলতাম। যখন জানতে পারলাম যে অকারণে কোনো প্রাণীর ছবি আঁকা হারাম, সাথে সাথে এই অভ্যাস ত্যাগ করলাম। তখন ভুল করে এঁকে ফেললেও দ্রুত কেটে দিতাম। অবস্থা একসময় এমন দাঁড়াল যে গান শোনা আর গান গাওয়ার মতো ছবি আঁকাআঁকিও পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিলাম। এখন আর কোনো কিছুই আমার চিন্তা-চেতনাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে না। এসব ছেড়ে দিয়ে কোনো কিছু হারাইনি আমি, বরং পেয়েছি মানসিকভাবে প্রশান্তিময় জীবন। একে কী স্যাক্রিফাইস বলা যায়? যায় না।

১৭.

বাবা একদিন বললেন দাদি নাকি খুব অসুস্থ। হার্ট অ্যাটাক করে হাসপাতালে ভর্তি। আমরা সপরিবারে দেখতে গেলাম। দাদি তখন আইসিইউ-তে, কথা বলতে পারিনি—চুপচাপ দেখে চলে এলাম। দাদিকে দেখার পর থেকেই মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। তিনি একটু সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরার পর আমি ছোটবোনকে সাথে নিয়ে একদিন চলে গেলাম দেখা করতে। ছোটবেলায় দুই ঈদে বাবা নিয়ে যেতেন আমাদের দাদির সাথে দেখা করতে। কখনো একা বসে কথা বলার সুযোগ হয়নি তার সাথে। আমাদের দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন তিনি। আদর করে ভাত খাওয়ালেন। অসুস্থতার কারণে তখন হাঁটতে পারেন না ঠিকমতো।

সেই প্রথম দেখলাম কাউকে চেয়ারে বসে ইশারায় সলাত আদায় করতে। আমাদের পড়াশোনার কী অবস্থা জানতে চাইলে বললাম আমার অবস্থার কথা। তিনি বললেন আমার জন্য টিউশনির ব্যবস্থা করে দেবেন।

কিছুদিন পর আবার গেলাম দাদির বাসায়। এবার আমি একা। তাকে জানালাম আমার ইসলামে বিশ্বাসের কথা। অনেকক্ষণ গল্প করলাম। টেবিলের ওপর এক কোনে দেখি আমার অপরিচিত প্রয়াত দাদার কিছু ইসলামী বই পড়ে আছে। সেগুলো ধার হিসেবে নিয়ে আসলাম পড়ার জন্য।

বইগুলো ছিল অনেক পুরোনো। তার মাঝে কয়েকটিতে রূপকথার মতো কেচ্ছা-কাহিনিতে ভরপুর। তখন ইসলামের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে বুঝতে পারিনি, শুধু ধারণা করতে পারছিলাম যে কিছু একটা সমস্যা আছে বইগুলোতে। তবে একটা বই ছিল জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা দেওয়া, সেই বই থেকে অনেক অজানা ব্যাপার জেনেছি। ঈমান আরও মজবুত হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে দাদি পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিলেন তার বাসার কাছাকাছি এক কোচিং সেন্টারে। মেজোখালা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি দুইজন ছাত্রী যোগাড় করে দিলেন। কোচিং সেন্টারে ক্লাস নাইন-টেনের ছেলেদের পড়াই। সকাল আটটায় ওখানে ক্লাস নিয়ে ভার্সিটিতে চলে যেতাম। সেখানে ক্লাস সেরে ফার্মগেটে দুই জায়গায় ছাত্রী পড়িয়ে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেত। প্রায় সারাদিনই আমার বাইরে কাটতে

লাগল। ছাত্রী দুইজন খ্রিষ্টান ছিল বলে ওদের ওখানে সলাত পড়া সম্ভব হতো না। বাসায় ফিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাতে একা একা বাদ পড়ে যাওয়া সলাত পড়ে শেষ করতাম। রাত জেগে কুরআনের অর্থের বাংলা অনুবাদ পড়তাম। সূরাহ আর দুআ মুখস্থ করতাম। ঈমানের লেভেল তখন আকাশছোঁয়া। ইচ্ছা করত কোনো উঁচু বিল্ডিংএর ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ঘোষনা দিই আমি মুসলিম হয়েছি। আমি একজন মুসলিমাহ। সমস্ত পৃথিবীতে সবচেয়ে সুখী মানুষ আমি। অথচ যেন অভিনয় করে চলেছি অন্য একজন হয়ে। আবার এর মাঝেই ঘটে গেল অদ্ভুত কিছু ঘটনা।

তখন পয়সা বাঁচানোর জন্য আমি পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতাম। বাসা থেকে বের হয়ে গলি পার হয়ে মাথায় ওড়না দিতাম, মা কোনোভাবে জেনে গেলে সমস্যা হবে খুব। একবার ছাত্রীর পরীক্ষা থাকায় পড়ানো শেষ হতে হতে রাত হয়ে গিয়েছিল। ছাত্রীর বাসা ছিল ফার্মগেইটে সিনেমা হলের পাশে। ওভারব্রিজের পাশ দিয়ে বাসস্টপ পার হয়ে যেতে হতো যেটা ওই সময়টিতে ঢাকার অন্যতম জনাকীর্ণ একটা জায়গা। লোডশেডিং কমানোর জন্য রাত আটটায় সব দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়াতে অন্ধকার অন্ধকার একটা ভাব চারদিকে। তাড়াহুড়ো করে ফেরার চেষ্টা করতে গিয়ে কী যেন হয়ে গেল, হঠাৎ দিক হারিয়ে ফেললাম আমি। অর্থাৎ কোন দিকে যাচ্ছি, কোন দিক থেকে এসেছি কিছুই বুঝতে পারছি না। কিছুদূর সামনে এগিয়ে যখন বুঝতে পারলাম তখন আমি সেই ভয়ংকর ভিড়ের মধ্যে চলে এসেছি। চারদিকে চাপাচাপি করে অসংখ্য মানুষ হেঁটে চলেছে। তার মাঝে আমি একা একজন মেয়েমানুষ। অজানা এক আতংক এসে ভর করল মনে। মনে পড়ল অনেক আগে কোনো এক উপন্যাসে পড়েছিলাম বিপদে পড়লে দুআ-দরুদ পড়তে হয়। দুআ তো আমার তখনও শেখা হয়নি, সলাত পড়ার জন্য দরুদ শিখেছিলাম। তা-ই পড়তে শুরু করলাম একনাগাড়ে। ঠিক তখনই অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটে গেল। আমার চারপাশে ফাঁকা হয়ে গেল। আমি হাঁটছি আর আমার সামনে, পেছনে আর দুই পাশে এক মানুষ সমান জায়গা খালি রেখে লোকজন হেঁটে যেতে লাগল। সম্পূর্ণ পথ এভাবেই পার হয়ে এলাম। একটুও স্পর্শ লাগল না কোথাও।

আরেকদিন ছাত্রী পড়াতে গিয়ে দেখি ওর মা ইন্ডিয়াতে মাদার তেরেজার কবরে গিয়ে কী কী যেন আশীর্বাদ করা জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন। কবরের ওপরে দেওয়া বাসি শুকনো ফুল, তেরেজার ছবিওয়ালা মেডেল, রোজারি মালা ইত্যাদি। আমাকেও দিলেন কয়েকটা। কিছু না বলে ব্যাগে নিয়ে নিলাম। এমন একটা সময় ছিল যখন অন্যান্য খ্রিস্টানদের মতোই আমার এ ধরনের জিনিশের উপর অপরিসীম ভক্তি ছিল। বেশ কিছু লকেট আর রোজারি সংগ্রহে ছিল আমার। ওগুলো ছুঁয়ে কত প্রার্থনা করতাম, চুমু খেতাম। রাতে ভয় পেলে বালিশের নীচে রেখে দিতাম। একবার রোজারি মালা ধুতে গিয়ে হাত থেকে বাথরুমে পড়ে গিয়েছিল বলে কষ্টে কেঁদে বুক ভাসিয়েছি। অথচ এখন চোখ খুলে যাওয়ার পর কতই না অর্থহীন আর হাস্যকর মনে হয় এসব। ওসব জড়বস্তুর কোনো ক্ষমতা আছে তা বিশ্বাস করাটাই তো বিরাট বোকামি। বাসায় ফিরে সবার আগে ওগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম।

একদিন সকাল থেকে বাম চোখে জ্বালা করছিল খুব। ভাবলাম চোখ উঠেছে হয়তো। পানি দিয়ে ভালো করে চোখ ধুয়ে এলাম। দুপুরের আগেই চোখের ভেতরে যন্ত্রণা বাড়তে বাড়তে অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেল। বাসায় আমি একা তখন। মাকে ফোন করে পাচ্ছিলাম না। কী আর করার। নিজেই চক্ষু হাসপাতালে চলে গেলাম। চোখে ওষুধ দিয়ে টেস্ট করে ডাক্তার বললেন ভাইরাল ইনফেকশান হয়েছে। কয়েকটা আই ড্রপস আর মলম লিখে দিলেন। নির্দিষ্ট সময় পর পর লাগাতে হবে। বাসায় ফিরে আবার ভালো করে চোখ ধুলাম। ব্যথা আরও বেড়ে গেল। আস্তে আস্তে চোখ এত ফুলে যেতে লাগল যে একসময় আর চোখ মেলে তাকাতে পারছিলাম না। এক চোখ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আরেক চোখও পুরোপুরি খুলতে পারছিলাম না। ব্যথায় রাতে জ্বর চলে আসলো। পরদিন বোনকে নিয়ে আবার হাসপাতালে গেলাম। ডাক্তার বললেন চোখে কোনোভাবেই পানি ছোঁয়ানো যাবে না, পানি লাগার সাথে সাথে ভাইরাস বাড়তে শুরু করে দেবে। পুরো এক মাস ভুগতে হয়েছিল। বোন খুব যত্ন নিত আমার। কখন কোন ওষুধ দিতে হবে মোবাইলে রিমাইন্ডার অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা পর পর এসে চোখে ওষুধ দিয়ে যেত ও। ব্যথায় কাঁদতাম সারাদিন। আলো সহ্য করতে পারতাম না। ঘর অন্ধকার করে সানগ্লাস পড়ে বসে থাকতাম। শুতে পারতাম না, ঘুমাতে পারতাম না। চোখ বন্ধ করলে কষ্ট হতো, আবার চোখ মেলে তাকানোর অবস্থাও ছিল না। ব্যথায় প্রতিদিন জ্বর আসত।

সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছিল ইসলাম নিয়ে পড়া বন্ধ হয়ে যাওয়াতে। ক্লাসেও যেতে পারছিলাম না, কিছুদিন পরেই ফাইনাল এক্সাম। সেই অবস্থায় প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়েছি। চোখে পানি না লাগিয়ে অযূ করাটা খুব কঠিন ছিল। সলাত পড়তে, সিজদাহ দিতে কেমন লাগত সেটা না হয় না-ই বললাম। শারীরিক কষ্টের চাইতে মানসিক কষ্ট বেশি ছিল তখন। কাঁদলে চোখের পানিতে ব্যথা আরও বেড়ে যেত।

এভাবে মাসখানেক ভোগার পর এক রাতে সলাত পড়ে আল্লাহর কাছে খুব কাঁদলাম। দুআ করলাম তিনি আমার চোখটা যেন দ্রুত ভালো করে দেন। এই 'দ্রুত' যে এত দ্রুত চলে আসবে ভাবতেও পারিনি। ঠিক পরের দিন সকালেই আশ্চর্যজনকভাবে আমার চোখ ভালো হয়ে গেল! একটুও ব্যথা নেই। ধীরে ধীরে ফোলা কমে গেল। চোখ স্বাভাবিক হয়ে আসলো। ঈমান বেড়ে গেল বহুগুণ।

এদিকে ভার্সিটিতে পর পর তিন সেমেস্টার ড্রপ হয়ে যাওয়াতে আমার ভর্তিই বাতিল হয়ে গেল। আমাকে আবার নতুন করে ভর্তি হতে হবে, আগের করা কোর্সগুলো আবার করতে হবে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি এবার একটুও মন খারাপ হলো না। যা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে। বিবিএ পড়ার সামান্যতম আগ্রহ বাকি ছিল না আর; যদিও ভবিষ্যতে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। এক মাস যেতে পারিনি দেখে কোচিং সেন্টারে আমার শিক্ষকতার কাজটাও চলে গেল।

টিউশনি করে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। বাসার কম্পিউটার প্রায় সারাদিন ভাইয়ের দখলে থাকে বলে নিজের জন্য একটা পুরোনো কম্পিউটার কিনে ফেললাম। সাথে ইন্টারনেট সংযোগ। এরপর শুরু হলো আমার জীবনের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অভিযান।

১৯.

-কী বললে? এখন আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ো না! কিন্তু কেন?

-আগে বাসায় থাকতে নিয়মিত পড়তাম, এখন হোস্টেলে আসার পর আর পড়া হয় না।

-ভয় লাগে না তোমার?

কথা হচ্ছিল ভার্সিটির এক বান্ধবীর সাথে। আমার বাসার কাছেই ওর হোস্টেল। তাই সেদিন একসাথে ফিরছিলাম বাসায়। রিকশায় বসে কথা প্রসঙ্গে জানাল এখন আর সলাত পড়ে না সে। প্রথম প্রথম মাথায় ওড়না দিতে দেখতাম, এখন তা-ও খসে গেছে। এভাবেই কি মুসলিমরা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধর্মহীন হয়ে যাচ্ছে? তারা পরিবারের চাপে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সলাত-সিয়াম-পর্দা করে। যদি নিজে বুঝে-শুনে ইসলাম মেনে চলত, তাহলে পরিবার থেকে দূরে থাকলেও কী আর না থাকলেও কী? জ্ঞানের অভাব। শুধু জ্ঞানের অভাবের কারণে আমাদের বর্তমান মুসলিম প্রজন্মের এই দুরবস্থা। তাদের মনে কোনো ভয়-ডর নেই, কারণ তারা মুখে বিশ্বাস করি বললেও মন থেকে পরকালে বিশ্বাস করে না। এ কারণেই হয়তো মুসলিম পরিবারগুলো থেকে ধর্ম দিন দিন উঠে যাচ্ছে। আমার নিজের ক্ষেত্রেও তো তা-ই হয়েছিল। একসময়ের ধার্মিক আমি গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমার মনে হয় এসব ছেলে-মেয়ের চেয়ে তাদের অভিভাবকরাই বেশি দায়ী। প্রকৃত ধর্ম শিক্ষাদানের অভাবে, সর্বোপরি তাদের নিজেদের অজ্ঞতার কারণে আজ তাদের সন্তানদের এই অবস্থা।

এ দেশের মানুষেরা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে অথচ ইসলামে যা নেই, যা করতে নিষেধ করা হয়েছে সেটাই বেশি করে মেনে চলে। অবৈধ কাজগুলোকে বৈধ বানিয়ে নিয়েছে তারা। কুরআন পড়ে অর্থ না বুঝেই, সলাতে কী পড়ছে না পড়ছে অধিকাংশই তা জানে না। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এক শ্রেণির 'মুসলিম' তৈরি হয়েছে যাদের নামে আর সার্টিফিকেটেই শুধু ইসলাম খুঁজে পাওয়া যায়। এ দেশের মুসলিমদের দেখলে বোঝা যায় না এরা মুসলিম, হিন্দু নাকি খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। তারা সলাত পড়ে, সিয়াম রাখে, হয়তো হজ্জ করে—অথচ ইসলামের জ্ঞান শূন্যের কোঠায়। আর যারা জানে তারা নিজেদের ইচ্ছামতো কিছু মানে তো কিছু মানে না। আল্লাহর ভয়, যাকে তাকওয়া বলা হয়—তা মানুষের মধ্যে নেই বললেই চলে।

আমি একবার এক মুসলিমের কাছে জানতে চাইলাম 'আল্লাহু আকবার' মানে কি। সে উত্তর জানে না বলে আরেকজন মুসলিমের কাছে জানতে চাইল। সেও বলতে পারল না। অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছি কিছু মুসলিম সলাত পড়ে, অথচ জানে না আযানে কী বলা হচ্ছে। অন্ধের মতো তারা জীবনের সবকিছুতেই পশ্চিমাদের অনুসরণ করে চলেছে, হঠাৎ করেই যেন খুব চোখে পড়ল ব্যাপারটা। তারা চলনে-

বলনে-পোশাকে-আশাকে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণ-অনুসরণ এমনভাবে করে যে মনে হয় নিজেদের পরিচয়, জন্মস্থান অথবা জাত নিয়ে তারা লজ্জিত। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন সারা বিশ্বে সব দিক দিয়ে ছিল মুসলিমদের আধিপত্য।

আচ্ছা, পরকালে বিশ্বাস আছে যার, যে জানে যে একদিন তাকে তার রব এর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে তার প্রত্যেকটি কাজের—কী করে সেই ব্যক্তি সলাত না পড়ে, পর্দা না করে চলে? কী করে সে সুদ খায়, হারাম উপার্জন করে? তার কি মনে একটুও ভয় নেই? নাকি তার বিশ্বাসেই গলদ। আসলে সে এটা বিশ্বাসই করে না যে কেয়ামাতের দিন বলতে কোনোকিছু আছে। আসলে তার মনে আল্লাহর ভয় নেই। আসলে সে আল্লাহকেই বিশ্বাস করে না। তার আচরণে মনে হয় সে আসলে মুসলিমই নয়।

কোচিং সেন্টারে ক্লাস নেওয়ার সময় একদিন দশম শ্রেণির ছাত্রদের কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছিলাম আমার ইসলামে বিশ্বাসের কথা। ওদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল খুব মেধাবী। যেকোনো পড়া একবার বোঝালেই বুঝে ফেলে। স্কুলেও নাকি ভালো করে। হাসতে হাসতে বলল সে, 'ইসলামে তো হাই তোলাও নিষেধ।' অর্থাৎ ইসলামে তার বিশ্বাস নেই। হয়তো বাপ-দাদার ধর্ম বলে অন্য সবার মতো এই ছেলেটিও নতুন পাঞ্জাবি পরে বাপ-চাচাদের সাথে ঈদের সলাত পড়তে যায়। ওই হাই তোলার ব্যাপারে তখন কিছু জানা ছিল না বলে আর কথা বাড়াইনি সেদিন। তবে হতাশ হয়েছিলাম খুব।

মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া নামধারী মুসলিমদের ওপর প্রথম প্রথম কেমন যেন একটা ঘৃণা বোধ করতে শুরু করলাম আমি। নতুন নতুন ইসলামে আসলে নাকি সবারই এমনটা হয়। চারপাশের পথভ্রষ্ট মুসলিমদেরকে নীচ আর নিজেকে উন্নত বলে মনে হতে লাগল। ভুলে গেলাম যে মাত্র কয়েকদিন আগে আমি নিজেই একজন কাফির ছিলাম। ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেই নিজেকে অনেক বেশি জ্ঞানী ভাবতে শুরু করলাম। এই জ্ঞান, এই হেদায়াত যে আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে, আমার যে এতে বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নেই তা ভুলে গেলাম।

একসময় যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলাম, তখন চারপাশের মুসলিমদের জন্য করুণা হতে লাগল আমার। আল্লাহর কাছে দুআ করতে লাগলাম তাদের সঠিক

পথে ফিরিয়ে আনার জন্য। রাস্তায় বের হলে, পূর্বপরিচিত মুসলিমদের সাথে দেখা হলে কষ্ট হতো খুব। অজ্ঞতার সাগরে ডুবে আছে এরা। মুখে বলে আল্লাহকে ভয় করি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নবী মানি—অথচ কাজের বেলায় এরা শুধুই নিজেদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা তথা প্রবৃত্তির দাসত্বে নিমজ্জিত। আমার আপন অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনেরা সঠিক পথে না আসলে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে—এসব কথা মনে হলে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যেত।

একদিন ছাত্রী পড়িয়ে বাসায় ফিরে দেখি টেবিলের ওপর কয়েকটা লিফলেট পড়ে আছে। খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন সেক্ট অর্থাৎ গোষ্ঠী থেকে প্রায়ই এ রকম লিফলেট আসে বলে প্রথমে অতটা খেয়াল করে দেখলাম না। পরে যখন পড়া শুরু করলাম রাগে আমার হাত পা সব কাঁপতে লাগল থর থর করে। কী হচ্ছে এসব!

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল কথাগুলো লিখে প্রচার করা হয়েছে। যিশু ইশ্বরের পুত্র; তিনি মানুষের পাপের বোঝা বহন করে মৃত্যুবরণ করেছেন; যিশু-ঈশ্বর-পবিত্র আত্মা—তিন সত্তা মিলে এক ব্যক্তি...এইসব কথা লেখা সেখানে। ভালো। খ্রিষ্টানরা নিজেদের ধর্মের কথা প্রচার করতেই পারে। তাতে আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু এখানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা ভয়াবহ অর্থ বহন করছে। প্রত্যেকটা লিফলেটে আল্লাহ, ঈসা, রুহ, দুনিয়া, ফেরেশতা, বেহেশত, দোজখ এসব শব্দের ছড়াছড়ি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের দেশের সাধারণ অজ্ঞ মুসলিম শ্রেণিকে টার্গেট করে প্রতারণার মাধ্যমে তাদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর লক্ষ্যেই এগুলো তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটা কথা এমনভাবে লেখা যে তারা মনে করবে ইসলামের কথা বলা হচ্ছে। খুব আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। খ্রিষ্টানরা যে ছবি ব্যবহার করে, যিশুর সেই ছবিও দেওয়া হয়েছে। অথচ এটা খ্রিষ্টানদের জন্য নয়।

জানি না কে বা কারা এই কাজ করেছে। কেনই বা শুধু আমার বাসায় দিয়ে গেছে এই লিফলেট। বিল্ডিং এর অন্যান্য ফ্লোরে খোঁজ নিয়ে জানলাম অন্য কোথাও এই লিফলেট দেওয়া হয়নি। মনে পড়ে গেল অনেক বছর আগে দেখা সেই যিশুর ফিল্মের কথা। সেখানেও প্রতারণার মাধ্যমে ধর্মপ্রচার চলছিল।

থমথমে নিস্তব্ধতা। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। হঠাৎ প্রচণ্ড ভূমিকম্প শুরু হলো! সবকিছু ভেঙে-চুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কিয়ামাত!

আচমকা ঘুম ভেঙে গেল, ঘেমে নেয়ে একাকার তখন। অলস দুপুরে কী একটা বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নটা দেখার পর খুব ভয় পেলাম সেদিন। একজন অবিশ্বাসী ছিলাম আমি, একজন কাফির। আল্লাহ কি মাফ করবেন আমাকে?

কম্পিউটার কেনার পর প্রথমেই পীস টিভিতে দেখা লেকচারারদের নাম লিখে সার্চ দিলাম। তাদের ওয়েবসাইটে নিয়মিত ব্রাউজ করতাম। বিভিন্ন ইসলামী কমিউনিটি ওয়েবসাইটে যোগ দিলাম। পেলাম ইউসুফ এস্টেসের shareislam, সালিহ আল মুনাজ্জিদের islamqa আর ড. বিলাল ফিলিপসের ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটির খোঁজ। সব নির্ভরযোগ্য ইসলামী জ্ঞানের অফুরন্ত ভান্ডার। ইসলামী ব্লগ আর ফোরামগুলো থেকেও শিখেছি অনেক কিছু। সার্চ করে করে শিখে নিলাম বিভিন্ন ইসলামী শব্দের অর্থ আর তাদের ব্যবহার—সুবহানআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইরান, বারাকাল্লাহু ফীক... ইত্যাদি। নওমুসলিমদের কাহিনি পড়ে অভিভূত হয়ে যেতাম। তাদের মনে হতো আমার আপন ভাই-বোন। কত বাধা-বিপত্তি পেড়িয়েও তারা দ্বীনের পথে অবিচল থেকেছে। খুব ইন্সপায়ারিং ছিল সেগুলো।

তখন IOU তে শুধু ডিপ্লোমা কোর্স বিনামূল্যে করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। তার কয়েক বছর পর ব্যাচেলর ডিগ্রি টিউশন ফি ফ্রি করা হয়। প্রথমেই আমি অ্যারাবিক রিডিং রাইটিং কোর্সে যোগ দিলাম। র উচ্চারণের জন্য প্রথম প্রথম rolling R প্র্যাকটিস করতেই বেশ কয়েকদিন সময় লেগে গেল। সারাদিন জলদস্যুদের মতো আররররর আরররররর করতাম। আকীদার কোর্সেও এনরোল করেছি তখন। জ্ঞান অর্জন করতে করতে ভালোই কাটছিল দিনগুলো।

ছোটবোন ততদিনে জেনে গেছে আমার ইসলামগ্রহণের কথা। ও নিজেও খুব আগ্রহ প্রকাশ করত, তাই বরাবরের মতো আমি নতুন যা কিছু শিখি ওর সাথে

আলোচনা করতাম। ধীরে ধীরে ও নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করল। আমার মতোই ও কখন যেন ইসলামে আত্মসমর্পণ করে ফেলল। তবে প্রথমদিকে শুধু বিশ্বাসটাই বদলেছিল ওর। কাজে-কর্মে আচরণে তখনও অমুসলিমদের মতো ছিল। তারপরেও ওর ইসলামে বিশ্বাসের কারণে আমার জন্য ইসলাম শেখা আর পালন করা আরও সহজ হয়ে গেল।

একদিন সলাতের জন্য কুরআনের সূরাহ শেখার জন্য মাউন্টহিরা নামের চমৎকার একটা ওয়েবসাইট পেয়ে গেলাম। বোনকে দেখালাম। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে হেডফোন দিয়ে শুনে শুনে মুখস্থ করতাম। ছোটবোনকেও দেখতাম দিনের বেলা শুনতে। কেউ দেখলে হয়তো ভাবত এভাবে গান শুনছে ও।

আমার বোনকে প্রথম প্রথম কম্পিউটারে বসলে শুধু ফেসবুকে গেইম খেলতে দেখতাম। আমারও ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছিল, আত্মীয়-স্বজন আর কাছের কিছু বন্ধুদের অ্যাড করা। আমিও একসময় আগে শুধু গেইম খেলার উদ্দেশ্যে ফেসবুক ব্যবহার করতাম। হঠাৎ কী মনে হতে নতুন আরেকটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেললাম ছদ্মনাম দিয়ে।

মুসলিম হয়েছি। অথচ এখনো আমাদের অমুসলিম নাম থাকবে, তা কী করে হয়। দুই বোন মিলে উৎসাহের সাথে নেটে সুন্দর অর্থবহ আরবী নাম খুঁজতে লেগে গেলাম। পর পর কয়েকদিন কয়েকশ নাম দেখার পরেও নিজের জন্য একটি নামও পছন্দ হলো না আমার। ছোটবোন বেছে নিল নাইলাহ নামটি। ফেসবুকে এই নামেই একটি অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলল সে।

এদিকে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলে সবার আগে ইসলামী গ্রুপ সার্চ দিলাম আমি। বেছে বেছে কয়েকটাতে যোগ দিলাম। আমার মতো নওমুসলিম মেয়েদের একটা গ্রুপ ছিল। সেখানে প্রায়ই যাতায়াত করতাম। সে সময় ফেসবুকের গ্রুপগুলো অন্যরকম ছিল। গ্রুপে ফোরাম ছিল যেখানে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আলোচনা চলত। এমনই এক ইসলামী গ্রুপের আলোচনা পড়তে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ করলাম ওরা বাংলাদেশি! ওরা নির্যাতিত মুসলিম বিশ্ব নিয়ে আলোচনা করছিল।

মুসলিম হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি ইসলাম সম্পর্কে যা কিছু জেনেছি, শিখেছি—সব বইপত্র, টিভি আর ইন্টারনেট থেকে। এর মাঝে অনলাইনে যতজন প্রকৃত মুসলিমের সাথে পরিচয় হয়েছিল তাদের মধ্যে বাংলাদেশি কেউ ছিল না।

এ দেশে সত্যিকারের ইসলাম জেনেবুঝে নিজের জীবনে মেনে চলে, এমন কারও অস্তিত্ব আছে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

একজনকে অ্যাড করে নিলাম। মেয়েটি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ওর সাথে পরিচয়ের পর ওর মাধ্যমে চমৎকার কিছু বোনের সাথে পরিচিত হলাম। ওরা সবাই প্রায় আমার সমবয়সী। ফেসবুকে সব ইসলামী পোস্ট দেয়—ইসলামী লেকচারের ভিডিও, ইসলাম নিয়ে লেখা নোট ইত্যাদি। ওদের কথাবার্তা সবকিছুই এত সুন্দর, এত মার্জিত—দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সবচেয়ে বড় কথা হলো এরা রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক কোনো দলের সাথেই যুক্ত নয়। স্রেফ কুরআন-সুন্নাহ পালনকারী মুসলিম।

একদিন ওই বোনদের মধ্যে একজন আমার সাথে দেখা করতে চাইল। তখন অসুস্থতার কারণে টিউশনি বন্ধ করে দিয়েছি। বাসা থেকে একেবারেই বের হই না। মা যদি কোনোভাবে জানতে পারেন আমি বের হয়েছি, তাহলে কোথায় গিয়েছি কেন গিয়েছি প্রশ্ন করে করে অস্থির করে তুলবেন। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময়ও নানির বাড়ির কেউ দেখে ফেলতে পারেন। খুব সাবধানে যেতে হবে। বোনকে বললাম সব কথা। মা ফোন করলে মিথ্যা বলতে হবে। এক দুপুরে চলে গেলাম বসুন্ধরা সিটিতে, মেয়েদের সলাত পড়ার স্থানে ওর থাকার কথা।

মন থেকে পুরোপুরিভাবে ইসলাম মেনে নেওয়ার পর এটাই ছিল প্রথমবারের মতো বাসা থেকে বের হওয়া। মনে হচ্ছিল রাস্তার প্রত্যেকটা মানুষ জানে আমি এখন মুসলিম—এমনকি যেই রিকশায় গেলাম সে রিকশাওয়ালাও। অসম্ভব ভালো লাগছিল। গন্তব্যে পৌঁছে হাঁটছি আর মনে হচ্ছে চারপাশের লোকজন যেন হাসিমুখে আমাকে স্বাগত জানাচ্ছে। আমার আর কোনো ভয় নেই, নেই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে অহেতুক দুঃশ্চিন্তা। আমি স্বাধীন, আমি মুসলিমাহ। স্বয়ং আল্লাহ আমার সহায় আছেন, আছে সমস্ত বিশ্বের যত মুসলিম ভাই-বোনেরা।

মেয়েটা আমাকে দূর থেকে দেখে ডাক দিল। দেখলাম আপাদমস্তক কালো হিজাব পরা এক মেয়ে দাঁড়িয়ে। কাছে যেতেই জড়িয়ে ধরল খুশিতে। যেন বহু বছর পর হারিয়ে যাওয়া বোনের সাথে দেখা। অনেক কথা হলো ওর সাথে। আসরের আযান দেওয়ার পর আমরা একসাথে ওযু করলাম। বই দেখে শিখেছি তাই ঠিকমতো

পারতাম না। ওর ওযু করা দেখে আমার ভুলগুলো সংশোধন করে নিলাম। এরপর সলাতের পালা। ওর সলাত দেখে নিজের সলাত ঠিক করার চেষ্টা করলাম। অবাক হয়ে লক্ষ করলাম এতদিন কতই না ভুলভাবে পড়েছি আমি! যেমন তাশাহহুদ, দরুদ আর দুআ প্রত্যেক রাকাতেই বসার পর পড়তাম। এখন দেখি শুধু দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহহুদ পড়তে হয়, আর শেষ রাকাতে বাকি যা আছে। ওগুলো পড়ার সময় ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সামনের দিকে নির্দেশ করতে হয়। আরও একটা ব্যাপার জানলাম, আসরের সলাতে জোরে শব্দ করে সূরাহ পড়তে হয় না।

সেদিন বাসায় ফিরে এসেছি অদ্ভুত এক ভালোলাগা নিয়ে। এখন আমি সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ। ইসলামকে দ্বীন, জীবনব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিয়েছি, বছরখানেক আগেও যা অবিশ্বাস্য ছিল। সঠিক পথের অনুসারী না হলে কেউ কখনোই বুঝতে পারবে না, অনুভব করতে পারবে না কী আশ্চর্য এক প্রশান্তি রয়েছে এই পথে। এখন আর কোনো কিছুতেই কিছু যায় আসে না। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। আমার পড়ালেখা ছেড়ে দেওয়াটাও আল্লাহর ইচ্ছা ছিল। আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসার জন্য এটি ছিল আল্লাহর পরিকল্পনার একটা অংশ। আর কোনো কষ্ট অবশিষ্ট রইল না। দুনিয়ার সবচাইতে সুখী মানুষ আমি।

সেদিন আমার বাসা থেকে বের হওয়ার খবর বোন ছাড়া আর কেউ জানল না। অথচ আমাদের মা সম্ভব হলে আমাদের প্রত্যেক মুহূর্তের হিসেব নেন। কখন কোথায় আছি, কী করছি না করছি একটু পর পর ফোন করে জানতে চান। মাকে ভীষণ ভয় পেতাম তখন।

একদিন ছোট বোন কলেজ থেকে ফিরে জানালো ওর যে সহপাঠী আমাকে বই পড়তে দিয়েছিল, সেই ভাইয়ের মা আমাদের মুসলিম হওয়ার খবর শুনে বাসায় দাওয়াত দিয়েছেন দুজনকে। অনেক দূরে তাদের বাসা। তারপরও আমরা বাসায় না বলে চলে গেলাম। আন্টি আমাদের দেখে খুব খুশি, অনেক যত্ন করে খাওয়ালেন। মন খুলে দুআ করলেন। বাসায় ফিরে মনে হচ্ছিল আর একা নই আমরা। মুসলিম উম্মাহ—বিশাল এক পরিবারের সদস্য আমরা।

২১.

বেশ কয়েকদিন ধরে মা হাসপাতালে। বাসার ঘরগুলোর দেওয়াল নতুন করে রঙ করা হচ্ছিল। সমস্ত আসবাবপত্র ওলটপালট করা। এই সুযোগে গোছাতে গিয়ে হাবিজাবি বাতিল জিনিসপত্র ফেলে দিচ্ছিলাম আমি। ইসলামে কোনো প্রাণীর ছবি বা মূর্তি রাখা নিষেধ। বাসায় যত শো-পীস ছিল, আমাদের পুতুল আর টেডিবেয়ার—বেশিরভাগ আমার নিজের কেনা। সব বড় একটা বাক্সে ভরে স্টোরে ফেলে দিলাম।

মা কয়েকদিন আগে বসার ঘরের দরজাজুড়ে বিশাল এক ছবি লাগিয়েছিলেন—যিশুর 'পবিত্র হৃদয়' (sacred heart) এর ছবি। প্রায় প্রত্যেক খ্রিষ্টানের বাসায় বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে এই প্রতিকী ছবি দেখা যায়। যিশুখ্রিষ্টের বুকে তার হৃদয় স্বর্গীয় আলোতে জ্বলজ্বল করছে, তার মাঝে একটি ক্রুশ। এই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে যিশুর কাছে প্রার্থনা করে অনেকে। আবার ঘুমাতে যাওয়ার আগে বা বাসা থেকে বের হওয়ার সময় এই ছবি ছুঁয়ে হাতে চুমু খায় কেউ কেউ। রঙ করার জন্য খুলতে গিয়ে ইচ্ছা করে টান মেরে মাঝখান থেকে ছিড়ে ফেললাম ছবিটা। পরে মা জিজ্ঞেস করাতে বাধ্য হয়ে রঙমিস্ত্রির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিস্তার পেয়েছিলাম।

একদিন যুহরের আযান শোনার পর সলাত কোথায় পড়ব ভাবছি। দেখি রঙমিস্ত্রি দুইজন হাতে পায়ে রঙ মাখা অবস্থায় কোনোরকমে ওযু করে ফার্নিচারের স্তূপের আড়ালে ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে গেল। তারা জামাতে সলাত পড়ছিল। আল্লাহু আকবার! কী যে ভালো লাগল দেখে! অথচ আমার মুসলিম বন্ধুদের দেখেছি সলাত না পড়ার জন্য অজুহাতের শেষ নেই। আমাদের ওই বাসায় আমি ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির আগে কখনো সলাত পড়া হয়নি। ঘর থেকে সব ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক জিনিসপত্র আগেই বিদায় করেছি। এবার মনে হচ্ছিল যেন সত্যি পবিত্র হয়ে উঠল ঘরটা।

এদিকে মা অপারেশানের আগের রাতে স্বপ্নে দেখলেন তিনি কবরের ভেতরে শুয়ে আছেন। লম্বা কালো জামা পরা দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি তার হাত ধরে বলছেন, 'আমার সাথে বলো—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...'। এরপরেই নাকি ঘুম ভেঙে গেল তার।

সবচাইতে আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল, মা জানতেন না ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মানে কী; তার জানা ছিল না যে এই কথাটা উচ্চারণ করেই মুসলিম হতে হয়।

বুঝলাম, স্বয়ং আল্লাহ দেখিয়েছেন এই স্বপ্ন। মাকে আহবান করা হয়েছে মুসলিম হতে। বাকিটা তিনি মায়ের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এখন মা যদি এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন, তাহলে হয়তো সঠিক পথ লাভ করতে পারবেন। দুঃখের বিষয় হলো—সেবার প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থা থেকে ফিরে এলেও পরবর্তীতে তিনি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর কথা বলতে চাইলেন না।

এ ঘটনার পর থেকে সাহস করে মাঝে মাঝে বোঝানোর চেষ্টা করতাম মাকে ইসলাম সম্পর্কে। তিনি শুনতে তো চাইতেনই না, আরও বিরক্ত হয়ে যেতেন। কখনো রেগে যেতেন আমার ওপর। কষ্টদায়ক কথা শোনাতেন। বলতেন, তিনি বাবার ধর্ম কখনো ছাড়তে পারবেন না।

যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঐ জিনিসের অনুসরণ করো যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই ওপর চলব, যার ওপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি, যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বুঝত না এবং সঠিক পথে চলত না তবুও? [সূরাহ বাকারাহ, ২:১৭০]

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আবারও রমাদান মাস এল। বছরের সর্বোত্তম মাস, যে মাসে আছে সর্বোত্তম রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। রমাদান। আমার মুসলিম জীবনের প্রথম রমাদান। শুরু হলো আমাদের দুইবোনের জীবনের নতুন আরেক অধ্যায়।

রমাদান। এই মাসে প্রত্যেক মুসলিমের ওপর সিয়াম থাকা বাধ্যতামূলক। যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের ভিত্তি—রমাদানে সিয়াম তার মধ্যে অন্যতম। নেট ঘেঁটে এ নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করে ফেললাম। বাংলাদেশে রোজা বলা হলেও সিয়াম আর রোজা এক নয়। রোজা মানে উপবাস। মুসলিমদের সিয়াম মানে শুধু না খেয়ে থাকা না। সিয়াম মানে বিরত থাকা। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত—এ

সময়ের মধ্যে পানাহার এবং যৌন সংসর্গ করলে সিয়াম ভঙ্গ হয়। তবে ইসলামের সব রকমের নিষিদ্ধ কাজে জড়ালেই সিয়াম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রনে রাখার প্রশিক্ষণের সময় হলো এই রমাদান।

আমরা দুইবোন যেহেতু এখন মুসলিম হয়েছি, আমাদেরও যেভাবে হোক সিয়াম রাখতেই হবে। রমাদানে মায়ের অফিস অন্যদিনের চেয়ে আগে ছুটি হবে। সিয়াম ভাঙার সময় মানে ইফতারের আগে মা চলে আসলে কীভাবে কী হবে ভাবছিলাম। তারপরও প্রথম দিনের আগের রাতে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে আমরা গোপনে সিয়াম রাখার প্রস্তুতি নিলাম। কিছু শুকনো খাবার আর খেজুর কিনে আমাদের শোয়ার ঘরের বইয়ের শেলফে লুকিয়ে রাখলাম। জীবনের প্রথম সিয়াম রাখতে যাচ্ছি। উত্তেজনায় ঘুমাতে পারছিলাম না আমরা। সে রাতে কোনোরকম বাধা বিপত্তি ছাড়াই রাতের খাবার খেয়ে সলাত পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম দুইজন।

সকালে ঘুম ভাঙল বেলা করে। মা অফিসে। সারাদিন নির্বিঘ্নে সিয়াম পালন করলাম। মা ফোনে জানালেন যানজট থেকে বাঁচতে ইফতারের ঠিক আগে আগে বের হবেন, তখন রাস্তা ফাঁকা থাকে। দুপুরের ভাত-তরকারী নিয়ে প্রস্তুত থাকলাম, মা যেন কোনোভাবে বুঝতে না পারেন আমরা দুপুরে কিছু খাইনি। ছোটবোন ছাত্রী পড়াতে যেত বিকালে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত হয়ে যেত। সকালে ছাত্রীর স্কুল আর বোনের কলেজে ক্লাস থাকার কারণে ওই সময়টা ছাড়া অন্য সময়ে পড়ানো সম্ভব ছিল না। আমাদের খালার মাধ্যমে ওই ছাত্রীর সাথে পরিচয়। সিয়াম থাকার কথা সেখানে জানানোর প্রশ্নই আসে না। অর্থাৎ ওর ইফতারের সময় খাবার মুখে দেওয়ার কোনো উপায় ছিল না।

সূর্যাস্তের আর বেশি বাকি নেই। কিছুক্ষণ পর আযান দিবে। ওযু করে ভাতের থালা সামনে রান্নাঘরে একা বসে আছি আমি। আস্তে আস্তে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। ইচ্ছা করেই আলো জ্বাললাম না। আযান শুরু হলো—

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার!

আল্লাহর নাম নিয়ে পানি মুখে দিলাম। কান্নায় গলা বুজে আসতে লাগল।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার!

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম। কষ্ট আর খুশি মেশানো কান্না। কত সৌভাগ্যবান আমি। বোনের কথা মনে করে খারাপ লাগল। বেচারি কিছু খেতে পেরেছে কি না জানি না।

এভাবে একের পর এক দিন চলে যেতে লাগল। ছুটির দিনগুলোতে বাধ্য হয়ে সলাত সিয়াম সব বাদ দিতে হচ্ছে। কখনো মা অফিস থেকে আগে চলে আসছেন বাসায়। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, আমি আর বোন জেগে থাকি। ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করি। আমি সারাদিনের জমে থাকা সলাত একসাথে পড়ি। ও তখনও সলাত পড়া শিখছিল।

রমাদান মাসে আল্লাহর প্রেরিত নবী মুহাম্মাদের কাছে কুরআন নাজিল হয়েছিল, আল্লাহ যেন তাঁর ওপর সলাত ও সালাম, শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ষণ করেন। রমাদানে মুসলিমরা বেশি বেশি কুরআন পড়ে থাকে। আমরা তখনও আরবী পড়তে জানি না বলে বাংলাতে এর অর্থের ভাবানুবাদ পড়তাম। আমি পড়ছিলাম তাফসীর (বিস্তারিত ব্যাখা-বিশ্লেষণ) আর বোন পড়ছিল অর্থের ভাবানুবাদ।

এদিকে আমার প্রতি মায়ের মনে সন্দেহ দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করছিল। বুঝতে পারছিলেন রাত জেগে আমি কিছু একটা করছি। মাঝে মাঝে ঘরে এসে চেক করে যেতেন। ইসলাম নিয়ে আজেবাজে কথা বলতেন। আমাকে হুমকি দিতেন বার বার—যদি মুসলিম হতে চাই তাহলে হয় নিজে মরবেন নয়তো আমাকেই মেরে ফেলবেন। জানি এসবই ছিল প্রচণ্ড রাগের মাথায় বলা কথা। আমি ভুল পথে যাচ্ছি ভেবে বলতেন। খুব বেশি ভালোবাসেন বলেই হারানোর ভয় করতেন। তবে খুব কষ্ট হতো আমার। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যেত। কী হবে সামনে, আর কতদিন এভাবে অভিনয় করে যেতে হবে, কেমন করে এই জীবন থেকে মুক্তি পাব—এইসব ভাবতাম আর কাঁদতাম।

দেখতে দেখতে রমাদান মাস শেষ হয়ে আসছে। জানলাম লাইলাতুল ক্বাদর নামের মহিমান্বিত এক রাতের কথা। ২৭ শে রমাদান শবে কদর নামের রাতের কথা আগে থেকেই জানতাম। জীবনে বহুবার এই রাতে মাসজিদের হুজুরের মাইকের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়েছি। শুনেছিলাম এই রাতে নাকি মুসলিমদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। পাপের ক্ষমা হয়। এবার এই রাত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিলাম নেটে। একে লাইলাতুল

ক্বাদর বলা হয়। হাজার মাসের চাইতে উত্তম এক রাত। মালাইকা বা ফেরেশতারা নেমে আসেন দুনিয়াতে। আল্লাহর রসুল আর তাঁর সাহাবীরা সারারাত জেগে সলাত পড়তেন, দুআ করতেন। জানলাম লাইলাতুল ক্বাদরের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ নেই। রমাদানের ঠিক কোন রাতটা এই রাত তা কেউ বলতে পারে না। রমাদান মাসের শেষের দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে সন্ধান করতে বলা হয়েছে এ রাতটি। কিছু নিদর্শন বলে দেওয়া হয়েছে—যা দেখলে আমরা সম্ভাব্য ক্বাদরের রাত হিসেবে ধারণা করে নিতে পারি। অর্থাৎ কোনো বছর এই রাত ২১ তারিখে, কোনো বছর ২৩, ২৫, ২৭ অথবা ২৯ এ।

তখন ছিল ২৭ রমাদানের রাত। মা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কী যেন বলেছিলেন বলে রেগে গিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছিলাম। ইসলামের পক্ষে বলেছি দেখে যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি। অনেক কথা শোনালেন।

গভীর রাতে মন খারাপ করে খোলা জানালার পাশে বসেছিলাম। সম্ভাব্য লাইলাতুল ক্বাদরের নিদর্শনগুলো সব আজ রাতের সাথে মিলে যাচ্ছে। বাইরে স্নিগ্ধ শান্তিময় রাত। মৃদু বাতাস বইছে। ছোট বোন তখন ঘুমিয়ে। কুরআনের অর্থের বাংলা ভাবানুবাদের বইটা হাতে নিলাম। হু হু করে কান্না বের হয়ে আসল বুক চিরে। ঝাপসা চোখে পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়ল সূরাহ আলে-ইমরানের ১৮৬ নাম্বার আয়াত।

অবশ্যই তোমাদের ধন-সম্পদ ও নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। তোমরা নিশ্চয়ই কিতাবধারীদের ও মুশরিকদের নিকট হতে দুঃখজনক অনেক কথা শুনবে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধরো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ।

সাথে সাথে মন ভালো হয়ে গেল! চোখ মুছে আরও পড়ে যেতে লাগলাম। একসময় বিছানার উপরেই ঘুমন্ত বোনের পাশে অন্ধকারে সলাত পড়তে শুরু করলাম। আমার বামদিকে ছিল দেওয়াল, আর ডানে ছোটবোন ঘুমিয়ে। তার পাশে সম্পূর্ণ ঘরটা ডিম-লাইটের আলোতে আবছা দেখা যাচ্ছে। সলাত শেষে প্রথমে ডানদিকে তারপর বামদিকে সালাম ফেরাতে হয়। ডানদিকে মাথা ঘোরাতেই এক মুহূর্তের জন্য অদ্ভুত এক ব্যাপার ঘটে গেল। যে বিছানার ওপর আমি ছিলাম, তার থেকে একটু দূরে, ঘরের মাঝামাঝিতে মেঝে থেকে প্রায় ছাদ পর্যন্ত বড় উজ্জ্বল সবুজ

একটি আলো দেখতে পেলাম। বাইরে থেকে আলোর প্রতিফলন হলে তা দেয়ালে বা কোনো বস্তুর ওপর পড়ার কথা। সেই আলো বা আলোময় বস্তুটি সেরকম ছিল না।

ডানে সালাম ফিরিয়ে ওই দৃশ্য দেখার পর দ্রুত বামে সালাম ফেরালাম। গায়েব হয়ে গেছে যা দেখেছিলাম। জানি না কেন একটুও ভয় পেলাম না আমি। চুপ করে বোনের পাশে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কী হতে পারে ওটা। সম্ভবত না খেয়ে থাকা এবং দুশ্চিন্তার কারণে ঘটা দৃষ্টিবিভ্রাট। আল্লাহই ভালো জানেন।

কিছুদিন পরই দেশের সরকার নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে। আমরা দুই বোন এবার প্রথমবারের মতো ভোটার হয়েছি। জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য এলাকার এক স্কুলে তোলা হচ্ছে ছবি। সবাই সেজেগুজে ভালো জামা পরে ছবি তোলাতে যাচ্ছে। এক সকালে কোচিং এর কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আমিও ছবি তুলিয়ে এলাম। পরে আইডি কার্ড হাতে পাওয়ার পর সবার সে কী হাসাহাসি। একেকজনকে দেখতে একেকটা ক্লাউনের মতো লাগছে। আমার ছবি দেখে নানির বাসার কেউ একজন বলল যে আমাকে দেখতে নাকি 'মুসলিম' বলে মনে হচ্ছে। বাকিরাও তার সাথে একমত। মনে মনে হাসলাম আমি। ভাগ্যিস শীতের সময় ছিল বলে গায়ে চাদর পেঁচিয়ে তুলতে পেরেছিলাম।

দেশে রাজনৈতিক গোলমাল চলছিল সেসময়। দেশের শাসনভার ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে। বেশ কিছু দ্বীনি বোন পেয়ে গিয়েছিলাম ফেসবুকে, যারা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও নতুন করে নিজেদের জীবনে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আবার ওদের মাধ্যমে পেয়েছি আরও নতুন নতুন বোন। এদের মধ্যে কয়েকজন একটি ইসলামী দলের সদস্য ছিল। এই দলটি পরে এদেশে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমার পরিচিতদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য নিজে থেকেই বের হয়ে এসেছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এরা প্রকাশ্যে নিজেদের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রায়ই এখানে সেখানে সেমিনারের আয়োজন করত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাত। লিফলেট, বই ইত্যাদি বিলি করত। তাদের

দলে যোগ না দিয়ে শুধু ইসলাম শেখার স্বার্থে ওই সেমিনারগুলোতে গিয়েছিলাম কয়েকবার।

ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাপার-স্যাপার সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না আমার। ওদের কাছ থেকে তখন অনেক অনেক কিছু জেনেছি, শিখেছি। যে আমি একসময় শুধু বন্ধু-আড্ডা-গান নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, দেশ-সমাজ-জাতি নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাইনি কখনো, সে আমি হঠাৎ রাজনীতি নিয়ে ভাবা শুরু করলাম। জ্ঞানের এক নতুন দুয়ার খুলে গেল যেন। রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিলাম। জানলাম মুসলিমদের প্রতি অমুসলিমদের অত্যাচার আর নিপীড়নের গল্প। আলজাজিরা নিউজ পড়ি নিয়মিত। যে বিষয়গুলো বুঝি না উইকিপিডিয়াতে সার্চ দিয়ে জেনে নিই। জানলাম ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, বসনিয়া, চেচনিয়া, সিরিয়া যুদ্ধের কথা। ২০০৮ এর ডিসেম্বর থেকে ২০০৯ এর জানুয়ারি পর্যন্ত ইসরায়েল যখন গণহত্যা চালাচ্ছিল ফিলিস্তিনের গাজা উপকূলে, সেই ডকুমেন্টারিগুলো দেখার সময় চোখের পানি ধরে রাখা মুশকিল হয়ে যেত। ধীরগতির ইন্টারনেট থাকার কারণে পিসিতে ডাউনলোড করে করে দেখতে হতো। জানলাম আফিয়া সিদ্দিকির কথা। আমার মুসলিম ভাই বোনদের ওপর করা অন্যায়-অবিচারের খবর পড়ে নিজের সমস্যাগুলো তখন তুচ্ছ মনে হতে লাগল।

সরকার নির্বাচনের দিন। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলাম ভোট দেব না। গণতান্ত্রিক সরকার নির্বাচনে আমি একজন মুসলিম হয়ে ভোট দেব—প্রশ্নই আসে না! ছোটবোনকেও বোঝানোর চেষ্টা করলাম যেন ভোট দিতে না যায়। ও বলল ‘না’ ভোট দেবে। সকালে মা আমাদের দুই বোনকে সাথে নিয়ে যাবে বলে তৈরি হতে বললেন। আমি যাব না বলাতে এত খেপে গেলেন যে বাধ্য হয়ে গেলাম সাথে। জানি না ভোট গণনার সময় লোকগুলো একটা সিলবিহীন ব্যালট পেপার পেয়ে কী করেছিল।

২৪.

কম্পিউটারে অপেরা ব্রাউজার ব্যবহার করতাম আমি। সেখানে Opera Notes নামের একটা plug-in ছিল। নতুন যা কিছু শিখতাম বিষয়ভিত্তিক আয়াত, হাদীস,

প্রবন্ধ অথবা লিংক সেখানে ভাগ করে করে নোট করে রাখতাম। কখনো কপি করে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে দিতাম।

kalamullah.com থেকে একের পর এক বই, লেকচার আর প্রবন্ধ ডাউনলোড করে করে হার্ডডিস্ক ভরিয়ে ফেলেছিলাম। নেটের গতি কম থাকার কারণে ইউটিউবের ভিডিও লোড হতে সময় লাগত। সেখান থেকে লেকচারগুলোও ডাউনলোড করে দেখতাম। পাসওয়ার্ড দেওয়া ছিল পিসিতে, যেন কেউ দেখতে না পারে। ইমাম আনওয়ার আল-আওলাকির চমৎকার একটা অডিও লেকচার সিরিজ শুনছিলাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীর ওপর।

এদিকে ফেসবুকে তখন দ্বীনের পথে একে একে যোগ দিচ্ছে অনেকেই। বাংলাদেশি মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া অথচ ইসলাম থেকে দূরে থাকা অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা একে একে ইসলামের পথে আসতে লাগল। আমরা সবাই একে অপরকে অ্যাড করে নিই। দ্বীন সম্পর্কে নতুন যা কিছু শিখি একে অপরের সাথে শেয়ার করি। এভাবে আমাদের নিজস্ব একটি নামহীন ভার্চুয়াল কমিউনিটি তৈরি হয়ে গেল, যা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছিল। আমাদের একমাত্র পরিচয় হলো আমরা মুসলিম—আল্লাহর দাস, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী। চোখের সামনে বেশ কিছু ভাই-বোনকে দেখেছি ধীরে ধীরে বদলে যেতে, পুরোপুরি ইসলামে আত্মসমর্পণ করতে।

এমনই এক ভাই ছিল তখন যাকে আমি প্রায়ই এটা সেটা উপদেশ দিতাম; ফেসবুকে ওর অনৈসলামিক কার্যকলাপ শুধরে দিতাম। যেমন কোনো গান পোস্ট করলে বলতাম গান শোনা কেন হারাম, সাথে সাথে গানটি মুছে দিত সে। বয়সে আমার চেয়ে প্রায় ছয় বছরের ছোট হওয়াতে নিজের ছোট ভাইয়ের মতোই মনে করতাম ওকে। আর ভাইটিও আমাকে ওর বড় বোনের মতো শ্রদ্ধা করত, মানত। সঠিকভাবে ইসলাম পালনের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। তাই আমি একজন নওমুসলিম জেনে আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল। ওর বন্ধুদের ইসলামের পথে আনার জন্য একদিন ও ফেসবুকে একটা ফ্যানপেইজ খুলে ফেলল। সাধারণ মুসলিমরা সহজেই যেন এখানে যোগ দিতে আকৃষ্ট হয় তাই খুব সাধারণ একটা নাম, I love Allaah (বর্তমানে IloveAllaah.com) বেছে নিল আর আমাকে অ্যাডমিন করে দিল।

দুইজন মিলে পেইজ চালাতে লাগলাম। নানা ইসলামী পোস্ট দিতাম আর ধীরে ধীরে ফ্যানের সংখ্যা বাড়তে লাগল। দেশ-বিদেশের যত মুসলিম আছে ফেসবুকে প্রায় সবাই যেন যোগ দিতে লাগল। ফ্যানদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে অ্যাডমিন হিসেবে নির্বাচিত করা হলো। তাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া হলো। মৌলিক ইসলামী বিষয়, যেমন: সলাত, সিয়াম, হাজ্ব, যাকাত, ঈমান, সীরাহ, বিদআত ইত্যাদি নিয়ে আমরা ইংরেজিতে যেসব আর্টিকেল শেয়ার করতাম সেগুলো অনেকেই ভালো বুঝত না বলে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ দেওয়া হলো।

ভাইটির মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের অদ্ভুত গুণ দিয়েছিলেন আল্লাহ। সবার চেয়ে বয়সে ছোট, যে তখনও এ লেভেলস শেষ করেনি—এমন একজন আমাদের কয়েকজন দেশি-বিদেশি অ্যাডমিন সাথে নিয়ে বিশাল কাণ্ড করে ফেলতে লাগল! একসময় পেইজের ফ্যানসংখ্যা মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেল। আলাদা ওয়েবসাইট খোলা হলো। মুসলিমদের সঠিক ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে, অমুসলিমদের ইসলামের পথে আহবান করা ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য। পেইজের কিছু একনিষ্ঠ সদস্য মিলে ভাইটির নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবী হিসেবে সময় দিয়ে দিন-রাত নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছিল। অল্প দিনেই ফেসবুকের শ্রেষ্ঠ ৫০ পেইজের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল আমাদের পেইজটি। অনেক অমুসলিম এখানে এসে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিল। এর কয়েক বছর পর ছেলেটি শুধু বাংলাভাষাভাষীদের জন্য আরেকটা পেইজ আর ওয়েবসাইট খুলে ফেলল। বর্তমানে 'কুরআনের আলো' নামের এই সাইটটি (www.quraneralo.com) নেট ব্যবহারকারী প্রায় সব বাঙালি মুসলিমদের মাঝে বেশ জনপ্রিয়।

পেইজে কাজ করতে গিয়ে সখ্যতা হয়েছিল বেশ কিছু দ্বীনি বোনের সাথে। শুরুর দিকের অ্যাডমিন এক আপুকে আমি ইন্দোনেশিয়ান মনে করেছিলাম। একদিন অনলাইনে সরাসরি কথা হলে জানতে পারি তিনি একজন বাংলাদেশি। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের একজন মানুষ তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের মাঝে আপন বোনের মতো সম্পর্ক হয়ে যায়। আমার সব কথা, সব সমস্যা তার সাথে শেয়ার করতে লাগলাম। আর ঠিক যেন বড় বোনের মতো পরামর্শ দিতেন তিনি। জীবনের সবকিছুকে ইতিবাচক চোখে দেখা তার কাছ থেকে শেখা। পরবর্তীতে আমার মুসলিম জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেওয়ার পেছনে তার অবদান অনস্বীকার্য।

আমাদের একটা ইসলামী ফেসবুক গ্রুপ ছিল যেখান থেকে আমরা এর সদস্যদের সরাসরি ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয় নিয়ে বার্তা পাঠাতাম (তখন গ্রুপ থেকে সরাসরি ইনবক্সে মেসেজ পাঠানো যেত)। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম সম্পর্কে লোকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করা। সেখান থেকে পরিচয় হয় আরেক আপুর সাথে। বয়সের দুজনের বিস্তর পার্থক্য থাকলেও ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব হয়ে যায় তার সাথে। খুব স্নেহ করতেন আমাকে তিনি। না দেখে, না শুনে শুধু আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা কাকে বলে এই বোনের কাছ থেকে শিখেছিলাম।

বড় খালারা যখন সপরিবারে অ্যামেরিকা চলে যান, আমি তখন অনেক ছোট। খালাতো বোনেরা ছিল আমার চাইতে বয়সে অনেক বড়। তাই বড়দের সাথে চিঠি বা ফোনে যোগাযোগ থাকলেও আমার সাথে তেমন একটা কথাবার্তা হয়নি কখনো। হঠাৎ এক খালাতো বোনের সাথে দেখা ফেসবুকে। আমি তো মহা খুশি। তৎক্ষণাৎ পরস্পরের স্কাইপের ঠিকানা আদান-প্রদান করে নিলাম।

স্কাইপে নিয়মিত আড্ডা চলতে লাগল। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে কথা হতো। প্রায় দশ বছর পর এভাবে কথা হচ্ছে। দূরত্ব ঘোচাতে সময় লাগল একটু। জেনে নিলাম পরস্পরের বর্তমান অবস্থা। ওর বিয়ে হয়েছে প্রেম করে, বাংলাদেশের এক মুসলিম পরিবারে জন্ম নেওয়া ছেলের সাথে। যার যার ধর্ম তার তার, কেউ কারও ধর্ম পালনে বাধা দিতে পারবে না—এ রকম একটা অলিখিত নীতি মেনে চলে তারা। আমার এই খালাতো বোনটি খুব ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। ছোটবেলায় এই বোনের সাথে গির্জায় গিয়েছি বহুবার। নিয়মিত বাইবেল পড়েন। শুনলাম এখনো নাকি যেখানেই যান, সব সময় ছোট একটা পকেট-সাইজ বাইবেল থাকে তার সাথে। আমাকে খ্রিস্টধর্ম নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা শোনালেন।

নির্যাতিত মুসলিমবিশ্ব নিয়ে কথা বলছিলাম একবার। তিনি আমাকে খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতনের খবরসমেত একগাদা লিংক পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বোনকে বোঝাতে পারলাম না যে খবরগুলো বানোয়াট। উল্টো দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেল।

তার ধর্মীয় বিশ্বাসের ধরন দেখে অদ্ভুত লেগেছিল। একটা মানুষ যখন মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে তার ধর্মটাই সঠিক, অন্য ধর্ম সব মিথ্যা—তখন কী করে সে চাইতে পারে যে তার ভালোবাসার মানুষটা বিপথে থাকুক? শুধু তা-ই না, তার সাথে কথা বলে আবিষ্কার করলাম ইসলামের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা রয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্পর্কে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কে তার কটূক্তি শুনে বেশ অবাক হলাম। তার স্বামী নাকি মুসলিম। তাহলে তারা একসাথে থাকেন কী করে। বুঝলাম আমার বাবার মতো দুলাভাইটি একজন পথভ্রষ্ট, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নাম-মাত্র এক মুসলিম। মানবিক ভালোবাসার টানে তারা একসাথে ঘর করছে। সেকুলার চিন্তাধারায় ধর্মকে পুরোপুরি মুছে দিয়ে অনেক কিছুই করা যায় তা বুঝলাম।

তবে আমি কখনো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাহীন ঘর চাইনি। আমার যার সাথে বিয়ে হবে তাকে শতভাগ মুসলিম হতে হবে। ইসলামের প্রতি, আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি পুরোপুরি আত্মসমর্পণকারী একজন। শুধু মুখে নয়, কথায় আর কাজে তাকে মুসলিম হতে হবে। আল্লাহর ওপর আমার এতটুকু ভরসা আছে, তিনি এ ব্যাপারে আমাকে নিরাশ করবেন না। তাই এই একটা ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম। চোখ বন্ধ করে সবটুকু সেই সত্তার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম যার হাতে আমার ভবিষ্যৎ।

এদিকে বেশ কিছুদিন যাবৎ খ্রিষ্টান কমিউনিটি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকার কারণে ঘন ঘন বিয়ের প্রস্তাব আসা থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। ছোটখালা একদিন জানালেন আমার জন্য পাত্র দেখেছেন তিনি। তার অফিসের কলিগ। বয়সে আমার চেয়ে দশ বছরের বড়, তো তাতে কী? সুদর্শন সুপুরুষ, বাড়ি-গাড়ি, ধন-সম্পদ সব আছে। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সবচেয়ে বড় কথা সে একজন ধার্মিক খ্রিষ্টান। এমন আদর্শ পাত্রের খবর পেয়ে আমার মা-নানি মনে হচ্ছিল না দেখেই রাজি হয়ে গেছেন।

দেখা করতে রাজি হচ্ছিলাম না বলে আমাকে না জানিয়ে জোর করে মা একদিন চার্চে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে টের পেলাম ঘটনা কী। এরপর আরও কয়েকবার কয়েকজনের জন্য বিয়ের পাত্রী হিসেবে আমাকে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকবারই আমাকে না জানিয়ে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কখনো নানির বাসায়, কখনো খালার বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে যাবার নাম করে। আমি এতই বোকা ছিলাম যে আগে থেকে

বুঝতে পারতাম না। একদিন খালার সাথে যেতে হলো মায়ের এক আত্মীয়ের বাসায়। আমার দূরসম্পর্কের মামা। যাওয়ার পর মামি যখন বললেন, এসো তোমাকে সাজিয়ে দিই। ওরা যে কোনো সময় চলে আসবে—তখন বুঝলাম আবারও বলির পাঠা হতে যাচ্ছি। শুনলাম এবার কোনো এক ভিনদেশি পাত্র দেখা হয়েছে। কী বিপদ! আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারে না, পারবেও না।

অনেক্ষণ ধরে বসে আছি, কেউ এল না। পরে ফোনে জানাল কী এক কারণে তারা বের হতে পারছে না। অন্যদিন ব্যবস্থা করতে। দুআতে কী না হয়!

যখন হাদীস পড়ে জেনেছিলাম যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ভ্রু তুলে যারা তাদের আল্লাহ নিজে অভিশাপ দিয়েছেন, আমি ভ্রু তোলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মায়ের কাছে এজন্য খুব কথা শুনতে হত। একদিন ধমক দিয়ে জোর করে নিয়ে গেলেন ভ্রু তুলতে। এমনভাবে পাকড়াও করেছিলেন যে না গিয়ে উপায় ছিল না। বাসায় ফিরে আয়নায় নিজের মুখ দেখে সেদিন খুব কেঁদেছি।

এভাবে জোর করে ধরে বেঁধে আমাকে দিয়ে অনেক কিছুই করানো হচ্ছিল। নয়তো কথার জ্বালায় টেকা মুশকিল হয়ে পড়ত। মায়ের কথা শুনতে না চাইলে তিনি বাধ্য করতেন। খালাতো বোনের বিয়েতে শাড়ি পরতে হবে, খ্রিষ্টমাস আর ইস্টার সানডের আগের রাতে সেজেগুজে চার্চে যেতে হবে, ভ্রু প্লাক করতে হবে... শুধু তা-ই নয়, জোর করে একদিন আমাকে সাজিয়ে ছবি তুলে ফেললেন কয়েকটা। সেই ছবি আবার ফেসবুকে আপলোড করা হলো। মায়ের কোনো ধারণাই ছিল না যে একজন মুসলিম মেয়ের জন্য এ ধরনের আচরণ কতটা অমানবিক, কত বড় অত্যাচার। ওরা খোলা চুলে পথে নেমে নিজেদের সৌন্দর্য দেখিয়ে বেড়ানোকে মনে করে স্বাধীনতা। আর পর্দা করে চলা মেয়েদের বলে বন্দী, নিপীড়িত। অথচ আমার ওই অবস্থায় নিজেকে বন্দী মনে হচ্ছিল, সেকুলার চিন্তাধারার কাছে বন্দী। কারও কোনো ক্ষতি না করেও আমি চাইলেও নিজের ইচ্ছামতো চলতে পারছিলাম না। এরচাইতে বড় বন্দিত্ব আর কী হতে পারে!

নাস্তিকতার দিনগুলোতে ডেথ মেটাল টাইপের স্যাটানিক গান পছন্দ করতাম, প্রায় সব গানেই এমন কথা আছে যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। আর ইসলামবিরোধী কথা না থাকলেও অহেতুক গান-বাজনা ইসলামে নিষিদ্ধ। সংগীত মানুষের মনকে

প্রভাবিত করে, তাকে মুনাফিক বানিয়ে দেয়। এটা জানার পর একসময় চব্বিশ ঘণ্টা গানের মাঝে ডুবে থাকা আমি ধীরে ধীরে গান শোনা কমিয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসলাম। এরপর গান শুনলেই অসহ্য লাগত। অথচ বাসার পরিবেশ এমন যে দিন-রাত গান-বাজনা শুনতে হতো আমাকে। অন্তর থেকে যার একবার এসব মুছে গেছে, তার জন্য এটা কতটা কষ্টকর তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

একদিন আমার বোন যখন কলেজে ক্লাস করছিল, মা বুক শেলফে ওর বই রাখার তাকে একটা নোটবুক খুঁজে পেলেন। সেখানে কুরআনের কয়েকটি আয়াতের উচ্চারণসহ বাংলা তর্জমা লেখা। হয়তো সলাত শেখার সময় লিখেছিল ও। ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন তিনি। ওকে তো কখনো এসব ব্যাপারে সন্দেহ করেননি। রাগে চিৎকার শুরু করে দিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করার পর বললাম আমি জানি না কখন কেন এসব লিখেছে ও। আয়াত লেখা পৃষ্ঠাগুলো ছিড়ে কুটি কুটি করে ফেলে দিলেন দরজার বাইরে। বোন বাসায় ফেরার পর শুরু হলো জেরা। আমার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে সেবার কোনোক্রমে পার পেয়েছিল ও। বাসায় ফেরার আগেই মোবাইলে মেসেজ করে কী বলতে হবে ঠিক করে নিয়েছিলাম। আমি যেহেতু মায়ের সন্দেহের তালিকায় আগে থেকেই আছি, নতুন করে আর ঝামেলা না বাড়ানোই ভালো। ওর কথা গোপন আছে—গোপনেই থাক।

প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে একদিন আমি আর বোন মিলে ঠিক করলাম আর না, এবার পালাতে হবে এখান থেকে। এত মানসিক চাপ আর সহ্য হচ্ছিল না। দুইজন মিলে শলা-পরামর্শ শুরু করে দিলাম। টিউশনি করে আমাদের যা আয় হয় তা দিয়ে সাধারণ একটা মহিলা-হোস্টেলে খুব সহজেই থাকা সম্ভব। প্রথমদিকে আমার সাহস হচ্ছিল না এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার। ছোটবোনকে বেশ ক্ষিপ্ত বলে মনে হলো। বলল আর না, আমার পক্ষে আর সম্ভব না এভাবে থাকা।

অগত্যা সেদিনই আমরা বের হয়ে গেলাম হোস্টেল খুঁজতে। পরিকল্পনা ছিল সব ঠিকঠাক করে বাসা ছেড়ে পালাব। পরে ফোন করে জানিয়ে দেব যে আমরা আর ফিরছি না। ফার্মগেটে অনেকগুলো মেয়েদের হোস্টেল আছে। ওখান থেকেই শুরু করা যাক।

যত আশা নিয়ে বের হয়েছিলাম, তত হতাশার সাথে ফেরত আসলাম। ঢাকায় এত কাছে বাড়ি থাকার পরেও হোস্টেলে কেন থাকতে চাই কর্তৃপক্ষের কাছে সদুত্তর দিতে পারলাম না। এক জায়গায় আমাদের কথাবার্তা শুনে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে জানানো হলো যে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া সিট পাওয়া যাবে না। আরেকটা বড় সমস্যা ছিল আমাদের বাজেট কম থাকার কারণে যেসব হোস্টেলগুলোতে গিয়েছিলাম সেখানের পরিবেশ দেখে থাকার ইচ্ছা চলে গিয়েছিল। এর চেয়ে আমাদের বাসার পরিবেশ হাজার গুণ ভালো। বোন অন্য এলাকায় আরও দেখতে চাইছিল। শেষে ওকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে বাসায় নিয়ে আসলাম। বাসায় ফিরে ওর সে কী কান্না! মুসলিম হয়েও অমুসলিম পরিবেশে থেকে অমুসলিমের অভিনয় করে চলাটা আসলেই খুব কঠিন।

আমরা দুআ অব্যাহত রাখলাম। এরপরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে যেতে লাগল।

২৬.

ইন্টারনেটে দ্বীনি বোনদের মধ্যে একজন ২০০৯ এর জুনে একদিন ফেসবুকে আমার এক পোস্টে কমেন্ট করে ফোন নাম্বার চাইল। ইনবক্সে নাম্বার দিলাম। সেদিনই অনেকক্ষণ কথা হলো ফোনে। ও জানতে চাইল আমার মুসলিম হওয়ার কথা প্রকাশ করেছি কি না। বললাম, এখনো আমার পরিবারের কেউ আমার আর আমার বোনের ইসলামগ্রহণের কথা জানে না। শুধু আবশ্যিক (ফার্দ) ইবাদাহগুলো গোপনে পালন করছি আমরা। আর বাকি সব ইসলামী কার্যকলাপ ছদ্মনামে ফেসবুকেই সীমাবদ্ধ। এ কথা শুনে ও জানালো এক নওমুসলিম ভাইয়ের কথা যে হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছিল। আমাদের মতই গোপনে ইসলাম পালন করছিল। স্বাধীনভাবে ইসলাম পালনের সুযোগ আসার আগেই দুনিয়াতে তার সময় শেষ হয়ে গেল।[২৫] পরিবারের লোকজন জানতেন না বলে ওর মৃতদেহ পোড়ানো হয়েছিল হিন্দুদের শ্মশানে। অল্প কয়েকজন বন্ধু যারা ওর ধর্মান্তরের কথা জানত, তারা উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে প্রতিবাদেরও সুযোগ পেল

---

২৫ ঈমানের সংজ্ঞানুযায়ী অন্তরে বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে ইসলাম পালন করা—এ তিনের নাম ঈমান। কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু মুখে স্বীকৃতি না দেয়, অর্থাৎ ইসলাম গোপন করে তবে সে অমুসলিম হিসেবেই ধার্য হবে। শুধু জীবননাশের আশঙ্কা থাকলে ইসলাম গোপনের অনুমতি আছে, তবে উত্তম হচ্ছে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে দেওয়া। - সম্পাদক।

না। বোনটা আরও জানাল, আমি চাইলে ও আমাদের শাহাদাহ নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। পুরো ব্যাপারটা গোপন থাকবে যতদিন না আমরা নিজেরা প্রকাশ্যে ইসলাম পালনের মতো অবস্থানে আসব। মুসলিম কমিউনিটির সাথে সরাসরি যুক্ত হতে পারলে আমাদের যেকোনো ধরনের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন তারা। রাজি হয়ে গেলাম আমি। আসলে এভাবে কোনোদিন ভাবিনি আগে।

কিছুদিন পর আবার ফোন এল। এ কথা সে কথার পর জানাল একটি অরাজনৈতিক, ইসলামী দাওয়াতী প্রতিষ্ঠানের কথা। এখানে দেশের প্রসিদ্ধ মুসলিম স্কলাররা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে ক্লাস করান। এখানে কুরআন শেখানো হয়, আরবী ভাষা শেখানো হয়। যে কেউ গিয়ে এসব ক্লাসে যোগ দিতে পারে। ইসলামী বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এখানে। এদের একটি জিমেইল গ্রুপ আছে। নিয়মিত ইসলামী বিষয়ে ই-মেইলে আলোচনা হয় গ্রুপ থেকে। আমি সেই গ্রুপে যোগ দিলাম। প্রতিদিন মনোযোগের সাথে প্রত্যেকটা মেইল পড়তে লাগলাম।

সেই বোন একদিন এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানকে জানাল আমাদের ইসলামগ্রহণের কথা। তিনি আমাদের দুই বোনকে মাসজিদে শাহাদা নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। দিন তারিখ ঠিক করে নিলাম আমি।

২১ জুন, ২০০৯। রবিবার। এগারোটার দিকে আমরা দুইবোন বের হলাম বাসা থেকে। বোনটা একটু দূরে গাড়িতে অপেক্ষায় ছিল। আমাকে দূর থেকে দেখে ডাক দিল। খুব এক্সাইটেড বলে মনে হলো। কাছে গিয়ে দেখি আপাদমস্তক কালো হিজাবে ঢাকা অল্পবয়সী এক মেয়ে। গাড়িতে উঠলাম। আমাদের দুই বোনের পরনে ছিল সাধারণ ফুলস্লিভ কামিজ আর মাথায় ওড়না। কিছুদূর যাওয়ার পর মেয়েটি গাড়ির ভেতরে বসেই দেখিয়ে দিল কেমন করে ওড়না মাথায় পেঁচিয়ে পরতে হবে। মেয়েদের গলা, ঘাড় আওরাহ (যা ঢেকে রাখতে হয়) এর অন্তর্ভুক্ত তা আমার জানা থাকলেও অভ্যস্ত হতে সময় লেগেছিল অনেক। প্রথম প্রথম চুল, গলা বের করে অন্যান্য সাধারণ মুসলিম মেয়েদের মতো পরতাম। সেদিনই প্রথম ওভাবে পরেছি। ছোটবোনের খুব কষ্ট হচ্ছিল গরমে। তারপরও কাউকে কিছু বুঝতে দিল না। হাসিমুখে ওভাবেই ছিল সারাক্ষণ।

মুহাম্মাদপুরের আল-আমীন মাসজিদ। জুমআর দিন এখানে মেয়েরাও সলাত পড়তে আসে। মেয়েদের জন্য মাসজিদের আরেক পাশে আলাদা প্রবেশপথ। সেদিন রবিবার ছিল বলে আমরা মেইন গেইট দিয়ে ঢুকেছিলাম। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। মনে হলো পুরুষদের ওদিকে কেউ একজন আছেন যিনি আমার বহু বছরের চেনা। অথচ এখানে কাউকেই চিনি না আমি। পুরো সময়টাতে একবারের জন্যেও তাদের কারও দিকে তাকিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি।

দোতলায় উঠে দেখি অনেকগুলো দ্বীনি বোন চলে এসেছেন। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগছিল। দেওয়ালের ওপাশ থেকে শায়খ আকরামুজ্জামান ছোটখাটো একটা খুতবাহ দিলেন। মনোযোগ দিয়ে শুনলাম সবাই। এরপর আমরা তার সাথে সাথে শাহাদাহ বাক্য উচ্চারণ করলাম।[২৬] একে একে সবাই এসে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানালেন। একজন হাসিখুশি চেহারার ভদ্রমহিলা আমাদের দুআর দুইটা বই উপহার দিলেন, সাথে দুই সেট কাপড়। কে যেন মিষ্টি নিয়ে এল। তারপর দই দেওয়া হলো। দই খাওয়ার মতো পাত্র ছিল না বলে সেই ভদ্রমহিলা যিনি বই দিয়েছিলেন তিনি আমাকে হাত পাততে বলে হাতের তালুতে দই ঢেলে দিলেন। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। জীবনে প্রথম কত কাজই না করতে হয় মানুষকে। প্রথমবারের মতো মাসজিদে এলাম, সবার সামনে শাহাদাহ নিলাম, প্রথম হাতের তালুতে দই চেটে খেলাম। বোনদের সাথে যুক্ত হতে পেরে খুব মজা লাগছিল।

অতঃপর জামাতে যোহরের সলাত পড়ানো হলো। সেই চাচা—যিনি আমাদের শাহাদাহ প্রোগ্রামের আয়োজক ছিলেন, তাঁর স্ত্রীর সাথে পরিচিত হলাম। প্রথম দেখাতেই তাঁকে খুব পছন্দ করে ফেললাম। আমাদের দুইবোনকে কিছু উপদেশ দিলেন তিনি। যিনি উপহার দিয়েছিলেন সেই ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন আমাদের মধ্যে কে বড়। উচ্চতায় বড় হলেও আমাকে সব সময় ছোটবোনের চেয়ে ছোট দেখায়। আর তাই অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আমার একটা বায়োডেটা চাইলেন তিনি। শুনলাম তার বড় ছেলের জন্য নাকি পাত্রী খোঁজা হচ্ছে।

---

২৬ ইসলাম পালন করছেন ও দাওয়াত দিচ্ছেন এমন মানুষদের শাহাদাহ পড়ানো একটা আনুষ্ঠানিকতা। যারা শাহাদাহ নেওয়ার আয়োজন করেছিলেন তারা সম্ভবত জানতেন না যে বোন দুজন আগেই মুসলিম হয়ে গেছে। তবে নওমুসলিমা হিসেবে মুসলিমসমাজে পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা প্রয়োজন ছিল। - সম্পাদক।

বাসায় কিছু না বলে বের হয়ে এসেছি। যেকোনো সময় ওদিকের কারও ফোন আসতে পারে মোবাইলে। অগত্যা তাড়াতাড়ি করে চলে আসতে হলো আমাদের। খুব ইচ্ছা হচ্ছিল আরও কিছুক্ষণ থাকি। প্রত্যেকের সাথে পরিচিত হই।

ফিরে এলাম বাসায়। কেউ ঘুণাক্ষরেও কিছু টের পেল না। মুসলিম হওয়ার পরে মানুষের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আমলনামা—যেখানে পাপ-পূন্যের হিসেব রাখা হয় তা নতুন করে লেখা শুরু হয়। মানুষ সদ্যজাত শিশুর মতই নিষ্পাপ হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ, সেদিন আল্লাহর প্রতি যে কৃতজ্ঞতা জন্মেছিল মনে, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

বাসায় ফিরে সেই খালাম্মার দেওয়া কাপড়ের ভাঁজ খুললাম। এ রকম কাপড় আগে কখনো দেখিনি আমরা। মাথার ওপর দিয়ে পরতে হয়। কোমর পর্যন্ত লম্বা, শুধু মুখের জায়গাটা ফাঁকা। ছোটবোন বলল, মনে হয় এটা পরে সলাত পড়তে হয়। পরে জেনেছি এর নাম হলো 'খিমার'। কেউ কেউ একে হিজাব বলে—যদিও হিজাব বলতে সমস্ত শরীরের আচ্ছাদনকে বোঝায়। আমরা সযত্নে লুকিয়ে রাখলাম খিমারদুটো।

সেই রাতে অপেক্ষায় আছি কখন সবাই ঘুমাতে যাবে আর আমি নতুন পাওয়া দুআর বইটা নিয়ে বসব। পরে অনেক রাতে সে বই পড়া শুরু করলাম। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের লেখা আইনে রাসুল সিরিজের বই। দুআ অধ্যায়। সকাল সন্ধ্যার যাবতীয় দুআসহ বিভিন্ন দুআর সংকলন। সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুম ঘুম চোখে বিছানায় শুয়ে পড়ছি, মাথায় কিছুই ঢুকছে না। হঠাৎ ঘরে মা এসে ঢুকলেন। ঘুম থেকে উঠে এসেছেন কখন যেন। তাড়াতাড়ি বালিশের নিচে লুকিয়ে রাখলাম বইটা। কিছুই বললেন না তিনি। লাইট জ্বালিয়ে রেখেছি বলে মৃদু ধমক দিয়ে লাইট অফ করে চলে গেলেন। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো তিনি পরদিন সকালে এসে দেখতে চাইলেন অত রাত জেগে কী বই পড়ছিলাম। ততক্ষণে সেই বইয়ের জায়গা দখল করে নিয়েছে মায়ের প্রিয় লেখক হুমায়ন আহমেদের বই। তিনি দেখলেন। আর কোনো সন্দেহ করলেন না। আল্লাহ বাঁচিয়ে দিলেন। রাতে দেখতে চাইলে কী করতাম আমি!

শাহাদাহ নিয়ে মুসলিম হয়েছি। কাহিনি এখানে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও এখানেই শেষ নয়। এখনো যে আমরা মুক্ত হতে পারিনি। পথের সবচাইতে বন্ধুর

অংশ—অর্থাৎ প্রকাশ্যে ইসলাম পালন করার মতো অবস্থায় আসতে এখনো অনেক পথ বাকি। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম।

কিছুদিন পর আমার বায়োডেটা চাওয়া হলো। সেই ভাইয়ের জন্য, যার মা আমাদের বই আর খিমার দিয়েছিলেন। বিয়ের জন্য বায়োডেটায় কী লিখতে হয় জানা ছিল না। স্যাম্পল হিসেবে একটা বায়োডেটা পেলাম—ব্যক্তি আর বর্ধিত পরিবার সম্পর্কে লেখা। আমার নিজের সম্পর্কে লেখার মতো তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। না পড়ালেখা, না অন্য কোনো যোগ্যতা। আর বাবার দিকের আত্মীয়দের সম্পর্কে তো বলতে গেলে কিছুই জানা নেই। আমার নাম আর জন্ম তারিখ লেখার পর আর কিছু লিখতে ইচ্ছা করল না। ওটাই দিলাম পাঠিয়ে। বললাম আপাতত এটা রাখো, পরে সব তথ্য সংগ্রহ করে সম্পূর্ণটা পাঠাব।

বার বার মনে হচ্ছিল কী করতে যাচ্ছি আমি! বিয়ে? এটাই কি একমাত্র সমাধান? বাবা-মা কাউকে জানানো যাবে না কোনোভাবেই। সর্বনাশ হয়ে যাবে তাহলে। জীবনের এত বড় একটা পদক্ষেপ একা কী করে নিই আমি? পাত্র সম্পর্কে কিচ্ছু জানি না। যারা ঘটকালির দায়িত্ব পালন করছেন তাদেরও আমি চিনি না। বোনটা ওর ফেসবুক ফ্রেন্ডলিস্ট থেকে সেই ভাইয়ের প্রোফাইলের ছবি পাঠালো আমাকে। তখনও নাম জানি না তার। ছবি দেখে চমকে উঠলাম। আলো-ছায়ার মাঝে মুখের সামান্য অংশ দেখা যাচ্ছে । ক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে। দেখলেই ভয় ভয় লাগে!

মেইলে পাত্রের বায়োডেটা পেলাম। চাচার কাছে সময় চাইলাম। এদিকে চাচার স্ত্রী প্রায়ই ফোন করতেন আমাকে। চাচি যখন বুঝতে পারলেন আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছি, তিনি আমাকে সেই ছেলে সম্পর্কে বলতে লাগলেন। নম্র-ভদ্র-সচ্চরিত্রের অধিকারী। ইসলাম মানার দিক থেকেও এগিয়ে আছেন তিনি। চাচা জানালেন তার পরিবারের কথা। বোনটাও মাঝে মাঝে ফোন করে খোঁজ-খবর নিত। ও জানাল পাত্রের বাসায় গিয়েছিল একদিন। এ রকম ভালো ইসলাম প্র্যাকটিসিং পরিবারে বিয়ে হওয়া নাকি মহা সৌভাগ্যের ব্যাপার।

এসব কথা শুনে আস্তে আস্তে আমার ধারণা বদলে যেতে লাগল। তারপরও আমি সময় চাইলাম। ছোটবোন আর অন্যান্য আপুদের সাথে আলোচনা করলাম। তখনও আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। তারা প্রত্যেকে আমাকে একই কথা শোনালেন। আমার জীবন, আমার সিদ্ধান্ত। তবে সব শুনে তাদের কাছে কোনোদিক থেকে রাজি না হওয়ার মতো মনে হলো না।

অবশেষে দাদির সাথে দেখা করে সব জানালাম। ছোটচাচাকে জানালেন তিনি। বায়োডেটার হার্ডকপি ছিল না বলে সফটকপিটাই পাঠিয়ে দিলাম চাচাকে। বার বার নিষেধ করে দিলাম আমার বাবার কানে যেন কোনোভাবে না যায় এই কথা। তাহলে নির্ঘাত মা জেনে যাবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে।

অবশেষে যা ভয় করেছিলাম তা-ই হলো। চাচা জানিয়ে দিলেন বাবাকে। আর বাবা জানালেন মাকে। না জানিয়ে থাকেনই বা কী করে? মেয়ের জীবনের এত বড় একটা ব্যাপার। মা শান্তভাবে বায়োডেটা দেখতে চাইলেন। দেখালাম। ছবি দেখতে চাইলেন। দেখালাম। নানিদের সাথে আলোচনা করলেন তিনি। মা-সহ সবাই ধরে নিলেন এই সেই বিশেষ ব্যক্তি যার সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক চলছে। যার কারণে আমার জীবনযাত্রায় এত বড় পরিবর্তন এসেছে। নয়তো আমার মতো মেয়ে কী কখনো মুসলিমদের প্রতি আকৃষ্ট হয়? বিগত অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানেন যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হয়। হয় মেয়ে পালিয়ে যায়, নয়তো জেদ ধরে বসে থাকে। আমার নিজের বাবা-মায়ের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল আর কি! এখন তো আর আমাকে জোর করেও অন্য কোথাও বিয়ে দেওয়া সম্ভব না। প্রেম না করলে না হয় সে চেষ্টা করা যেত।

প্রাথমিকভাবে তারা হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। তবে হাব-ভাবে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন যে তারা কেউই রাজি নন। মা আমাকে কয়েকবার বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। একসময় কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। কিন্তু আমি আমার অবস্থানে অটল রইলাম। আমার সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা ভাঙিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টাই করলাম না। যা খুশি ভাবুক এরা। আমি আর পারছি না।

২৮.

এদিকে সেই চাচা আর চাচির সাথে কথা হয় প্রায় প্রতিদিন। আমার বর্তমান অবস্থায় কী করণীয়, যা করছি তা ঠিক হচ্ছে কি না—চাচা খুব সুন্দর করে উদাহরণ দিয়ে বোঝান। জীবনের এত বড় একটা সিদ্ধান্ত আমি বাবা-মাকে ছাড়া একা নিতে যাচ্ছি। কাছের মানুষগুলোকেও জানাতে পারছি না। আমার এই কঠিন সময়ে দুই বড় আপু অনেক দূরে থেকেও অনুপ্রেরণা দিয়ে, সাহস যুগিয়ে পাশে ছিলেন। জানতে পারলাম, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাকে ইস্তিখারার সলাত আদায় করতে হবে। উপহার পাওয়া দুআর বইতে খুঁজে পেলাম নিয়ম। এর ঠিক পরের দিন ফেসবুকে কেউ একজন নোট লিখল এই ব্যাপারে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের এই দুআ এমনভাবে শেখাতেন যেভাবে তাঁদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে দুই রাকাত সলাতের পর পড়তে হবে এই বিশেষ দুআ। সলাতের পরে কাজটার ব্যাপারে আল্লাহ অন্তর খুলে দেবেন অথবা সংকুচিত করে দেবেন। যদি মনের ভাব স্পষ্ট না হয় তবে আবার ইস্তিখারার সলাত আদায় করতে হবে। ইস্তেখারার সাথে সাথে বিজ্ঞ কোনো ভালো মানুষের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

আমি ইস্তিখারার সলাত আদায় করলাম। এরপর চাচার সাথে কথা বলে পাত্রের সাথে দেখা করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিলাম।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি কোনো এক বুধবারের রাত। হঠাৎ খুব জ্বর চলে আসল আমার। সেই সাথে ঠান্ডা লেগে অবস্থা খারাপ। রাতে স্বপ্ন দেখলাম বাবা আমাকে তার বাইকে বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন পাত্রের সাথে দেখা করার জন্য। এই স্বপ্নকে আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন হিসেবে ধরে নিলাম।

বৃহস্পতিবার সকালে চাচার সেই প্রতিষ্ঠানে দেখা করার কথা ঠিক হয়েছিল। চাচা বাসার কাছে গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে গেলাম। দেখা হলো, কথাও হলো। তাকে জানালাম আমি এমন একটি পরিবারে থাকতে চাই যেখানে আমার আল্লাহর হুকুম মেনে চলার পথে কোনো বাধা আসবে না। তবে বিয়ের ব্যাপারে আমি যা-ই করি না কেন আমার পরিবারকে না জানিয়ে করতে হবে। আমার জন্য

কাজটা খুব কঠিন হয়ে যাবে। নিজের জন্মদাত্রী মাকে কষ্ট দিতে হবে। কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে আর কোনো কথা বলতে পারলাম না। তিনি জানিয়ে দিলেন এই বিয়েতে তার কোনো আপত্তি নেই। আর আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানোর আগে আরও কিছুদিন সময় চেয়ে নিলাম।

এদিকে বাসায় আমার ওপর ঝড় বয়ে যেতে লাগল। বাসায় তো বটেই—মা অফিস থেকে পর্যন্ত আমাকে ফোন করে করে কাঁদতে লাগলেন। আমি কেন অন্য মেয়েদের মতো না, কেন আমি এ রকম হলাম, কারা আমার ব্রেইনওয়াশ করেছে...। যখন বলতেন আমি বেঈমানী করছি, তখন মনে মনে না হেসে পারতাম না। ঈমান আর বে-ঈমানের প্রকৃত অর্থ কী, তা যদি তিনি বুঝতেন তাহলে তো কোনো সমস্যাই ছিল না। চাচার উপদেশ অনুযায়ী, মা যা কিছুই বলেন চুপ করে শুনে যেতাম। কোনো উত্তর দিতাম না। মাঝে মাঝে বোঝানোর চেষ্টা যে একেবারেই করতাম না তা না। তবুও তারা তাদের ধারণাতেই অটল। হয় আমি প্রেম করেছি বলে মুসলিম ছেলের সাথে বিয়ে হতে চাইছি, নয়তো কে বা কারা আমার ব্রেইনওয়াশ করে ফেলেছে বলে মুসলিম হতে চাইছি। কোনো মানুষ যে জেনেবুঝে ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করতে পারে তা তাদের ধারণার বাইরে ছিল।

বাবা-মা বুঝলেন আমি জেদ ধরে বসে আছি এখানেই বিয়ে করব বলে। আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেও আর পারছিলেন না যখন, তখন মাকে রাজি করালাম পাত্রপক্ষের সাথে কথা বলতে। দাদির বাসাতে একদিন তাদের আসতে বলা হলো। জানি মা কখনোই চাইবেন না একজন দাড়িওয়ালা 'হুজুরের' সাথে তার মেয়ের বিয়ে হোক। বাবা-মা যাওয়ার সময় আমিও সাথে যেতে চাইলাম। মা কড়াভাবে নিষেধ করলেন যেতে।

পরে যা ভেবেছিলাম তা-ই হলো। হুজুর বাবা-মায়ের সাথে হুজুর ছেলে দেখে মা তাদের অপছন্দ করে ফেললেন। এটাই স্বাভাবিক ছিল। তিন বছর আগে হলে আমিও তা-ই করতাম। আজকাল মুসলিম পরিবারের অভিভাবকেরাই যেখানে এ ধরনের বেশভূষাওয়ালাদের পছন্দ করে না, সেখানে আমার মা তো অমুসলিম!

আর কিছুদিন পরেই রমাদান মাস শুরু হতে যাচ্ছে। তারা চাইছিলেন তার আগেই বিয়েটা সেরে ফেলতে। কিন্তু আমি মুসলিম হতে আগ্রহী—এত বড় একটা ধাক্কা

সামলে ওঠার আগেই আমার মা তার সবচেয়ে আদরের মেয়েটির বিয়ের ব্যাপারে কেমন করে এত তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন? ঠিকভাবে চিন্তাভাবনা করতে পারছিলেন না তিনি। খুব কষ্টকর একটা পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন তিনি। নিজের মেয়ের ভালো চাইছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরা তার মেয়েকে জোর করে বোরখা পরাবে, 'কোরান' পড়াবে—তাদের মতোই হুজুর বানিয়ে ছাড়বে। মেয়ের ব্রেইনওয়াশ করা হয়েছে বলে অবুঝের মতো নিজের সর্বনাশ করতে যাচ্ছে।

বাসায় ফিরে আবারও অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বুঝিয়ে, রাগ দেখিয়ে কোনোভাবেই যখন কিছু করতে পারলেন না, মা তখন আমার সাথে কথা বলা পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেন। বাসায় যতক্ষণ থাকেন মুখ অন্ধকার করে থাকেন সারাক্ষণ। যখন তখন কাঁদেন। এভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর আর থাকতে না পেরে একদিন জানিয়ে দিলাম আমার ইসলামগ্রহণের কথা। বললাম আমি এখন মুসলিম হয়েছি। এখানে এই পরিবেশে আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না সঠিকভাবে ইসলাম পালন করা। আর তাই এমন কোথাও চলে যেতে চাই যেখানে একজন মুসলিম হিসেবে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারব। যেখানে আমার দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। জোর করে কারও বিশ্বাস বদলানো যায় না। আমি যা বিশ্বাস করি তা জেনেবুঝে করি। অন্ধের মতো বাপ-দাদার ধর্মের অনুসারী নই আমি।

মা হঠাৎ বললেন আমি যার সাথে বিয়ে হতে চাই তার সাথে তিনি সরাসরি কথা বলতে চান। চাচার মাধ্যমে খবর পাঠালাম বাসায় আসতে তাকে। তিনি এলেন, কথা বললেন মা আর নানির সাথে। নানি বার বার জানতে চাচ্ছিলেন আমাকে 'কোরান' পড়তে হবে কী না...বোরখা পরার জন্য জোর করা হবে কি না। তিনি অভয় দিলেন—কোনো কিছুতেই জোর করা হবে না, মেয়ে যা করার স্বেচ্ছায় করবে।

তিনি চলে যাওয়ার পর আবার নতুন করে শুরু হলো আমাকে বোঝানোর পর্ব: 'মুসলিম হয়েছ ভালো কথা। তোমাকে মুসলিম ছেলের সাথেই বিয়ে দেওয়া হবে। তবে এখানে নয়, এরা বড় তাড়াহুড়ো করতে চাইছে। আমরা যেখানে চাই সেখানে ধীরেসুস্থে বিয়ে দেব তোমাকে। আমাদের প্রস্তুতির একটা ব্যাপার আছে। বাবা-মা হিসেবে এতটুকু অধিকার তো আছে আমাদের...'

মনে মনে ভাবলাম, তোমাদের পছন্দের মুসলিম ছেলে সত্যিকার অর্থে 'মুসলিম' কি না তা আল্লাহ ভালো জানেন। মুখে কিছু না বলে চুপ করে রইলাম।

অবশেষে আমাকে না জানিয়ে দাদির সাথে কথা বললেন বাবা। তাকে জানিয়ে দিলেন যে এখানে সম্পর্ক করতে রাজি নন তারা। দাদি তাদের মানা করে দিলেন। এদিকে আমি চাচাকে বললাম পাত্রপক্ষের সাথে কথা বলে বিয়ের তারিখ ঠিক করতে। এভাবে আর নয়।

'আপনি বলুন: আমার প্রার্থনা, আমার আত্মত্যাগ এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। [সূরাহ আল আনআম, ৬: ১৬২]

আমরা মুসলিমরা সবকিছু আমাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য করি। যখন এটা বুঝতে পারি যে আমার সমস্ত কর্ম, আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চিন্তা-চেতনা থেকে শুরু করে সব কিছু শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে পেরেছি, তখন যে পরিমাণ আত্মতুষ্টি লাভ করা যায় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ইসলামে সত্যিই শান্তি আছে। এখানে কেউ স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের জন্য বাঁচে না। তবুও এতকাল ধরে কষ্টে লালনকারী বাবা-মাকে ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নে একটুও যে দ্বিধা হচ্ছিল না মনে তা না। আমার প্রতিপালক যার হাতে আমার বাবা-মায়ের প্রাণ, সেই সত্তার আদেশ-নিষেধ স্বাধীনভাবে পালন করার জন্যই আমাকে এই কঠিনতম পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। মহান আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জন্য দুনিয়ার সবকিছু ছাড়তে রাজি আছি আমি। তুচ্ছ মানুষের প্রেমে মানুষ ঘর-পরিবার-দেশ ছাড়তে পারে, আর আমি তো আমার রবকে ভালোবেসেছি।

রমাদান মাস। আগের মতো এবারও দুই বোন গোপনে সিয়াম রেখে যাচ্ছিলাম। মায়ের কড়া নজরদারিতে বাসা থেকে বের হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল আমার। বোন যখন তখন বের হতে পারত, ওকে নিয়ে কেউ কিছু সন্দেহ করেনি তখনও। বিকালে মা বাসায় চলে আসেন বলে সকালের আগে বের হওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। ছুটির দিনগুলোতে তো সিয়াম পর্যন্ত রাখা হচ্ছে না। আর তাই চাচার সাথে ফোনে

আলোচনা করে বিয়ের দিন-তারিখ এমনভাবে নির্ধারণ করলাম যেন দুই পক্ষের জন্য সহজ হয়। ২৬ রমাদান, বৃহস্পতিবার সকালে।

দ্বীনি বোনেরা খবর পেয়ে নিজেরাই প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করে দিল। সবার আগে এগিয়ে এল আমার ছোটবোন। ছাত্রী পড়িয়ে যে অল্প কিছু টাকা জমিয়েছিল তা দিয়ে আমার জন্য কিনে ফেলল কয়েক সেট জামা-কাপড়। দাদির বাসায় বিয়ে হবে বলে ও প্রতিদিন বাসা থেকে বের হওয়ার সময় একটি দুটি করে আমার জামা-কাপড় নিয়ে রেখে আসত সেখানে। সারাক্ষণ আমার পাশে থেকে সমর্থন আর সাহস যুগিয়েছে মেয়েটি। আমার জীবনের সবচেয়ে কঠিন সেই সময়ে ওর কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি তার প্রতিদান দেওয়ার সামর্থ্য নেই আমার।

পরিবারে এটাই প্রথম বিয়ে। আত্মীয়দের মধ্যে কারও বিয়েতে সরাসরি অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়নি। তাই বিয়েতে কী কী করতে হয় জানা ছিল না আমাদের। এছাড়া মুসলিমদের বিয়ে কেমন করে হয় তা নিয়ে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। যথারীতি এটা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে দিলাম। দুই এক দিনের মাঝে মুসলিম বিয়ে-সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক কিছু জেনে ফেললাম।

মুসলিমদের বিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ আর সুন্দর পন্থায় সম্পন্ন হওয়া বিয়ে। বিয়েতে কনের অভিভাবককে বলা হয় কনের 'ওয়ালি'। ওয়ালি কনের সম্মতি নেবেন কোনো একটি ছেলের সাথে বিয়ের ব্যাপারে। এরপর তিনি ছেলেটিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানা আদায়ের সাপেক্ষে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন; একে বলা হয় ইজাব। বর কবুল বলার মাধ্যমে সম্মতি জানিয়ে মেয়েটিকে তার স্ত্রী হিসেবে কবুল করে নেবেন। ওয়ালি, বর এবং দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে মুসলিম বিয়ে সংঘটিত হয়। মোহরানা বিয়ের অন্যতম শর্ত। মোহরানা হলো বর এর পক্ষ থেকে কনে-কে দেওয়ার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ, যা কনেকে সম্মানের সাথে তার প্রাপ্য হিসেবে দেওয়া হয়।[২৭]

যার সাথে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে তিনি একদিন জানতে চাইলেন আমি মোহরানা কত নিতে চাই। তার নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য যা দিতে পারবেন

---

২৭ বাংলাদেশের বিয়েগুলোতে ইসলামের চেয়ে হিন্দুধর্মের ছাপ স্পষ্ট। ছেলেপক্ষের যেখানে মোহর দেওয়ার কথা সেখানে মোহরকে দেনমোহর হিসেবে একটি প্রতিকী ব্যাপার করে রাখা হয়েছে। আর হিন্দু পণপ্রথার অনুকরণে মেয়েপক্ষকে যৌতুক হিসেবে নগদ অর্থ, গহনা এবং অন্যান্য উপহার দিতে বাধ্য করা হয়। যৌতুক দিতে ব্যর্থ হলে নববধূর ওপরে নানারকম দৈহিক এবং মানসিক নির্যাতন করা হয়। -সম্পাদক।

বলে জানালেন আমি তাতেই রাজি হয়ে গেলাম। আমার কাছে টাকা-পয়সা, ধন-দৌলতের কোনো মূল্য নেই, কখনো ছিলও না।

আমার পরিবারের কেউ যেন কারও বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে না পারে, তাই একটি লিখিত দলিলের প্রয়োজন ছিল। হবু বর নিজে আমার এফিডেবিট করিয়ে দিলেন। নতুন নাম ঠিক করে দিলেন আমার হবু শাশুড়ি। নেট ঘেটে জানতে পেরেছিলাম আমার আগের নাম কর্নেলিয়া স্টেফানি অর্থ শৃঙ্গাযুক্ত মুকুট। তিনি নাম দিলেন সিহিন্তা—যার অর্থ মহামূল্যবান মুকুট।

বিয়ের আগের রাতে সারারাত জেগে মাকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি লিখে ফেললাম। আমি কেন এই পথ বেছে নিলাম, কেন আমি এভাবে চলে যেতে বাধ্য হলাম। একবার মা এসে দেখে গেলেন কিছু একটা লেখালেখি করছি আমি। ভাবলেন ডায়েরি লিখছি হয়তো। কিছু না বলে চলে গেলেন তিনি।

আমার কাছের মানুষ, আমার ঘর, আমার অধিকারভুক্ত সমস্ত জিনিসপত্র—সবকিছু ছেড়ে চিরদিনের জন্য দূরে চলে যাচ্ছি। তারপরও কেন জানি সেই রাতে একটুও কান্না পেল না আমার। একটুও না! ইসলামের জন্য আত্মত্যাগে আসলে ত্যাগের কিছু নেই। বরং ইসলামের জন্য, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলার জন্য কিছু ছাড়ার মাধ্যমেই পাওয়া যায় পরম শান্তি।

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯। আমার বিয়ের দিন। সব ছেড়ে চলে আসার দিন।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সকালে উঠে ছোটবোন কলেজে ক্লাস করতে চলে গেল। মা বের হলেন অফিসের উদ্দেশে। বাবা নাস্তা শেষে বসার ঘরে বসে টিভি দেখছিলেন আর ছোট ভাই ঘুম থেকে উঠেনি তখনও। রাতে লেখা চিঠিটা সযত্নে মায়ের আলমারিতে রেখে ব্যাগ গুছিয়ে প্রস্তুত হলাম। বসার ঘর দিয়ে গিয়ে বারান্দাতে ছিল বাইরে বের হওয়ার দরজা। প্রথমে কাপড়-চোপরের বড় ব্যাগটা রেখে এলাম বারান্দায়। টিভির টক শোতে মগ্ন ছিলেন বলে খেয়াল করলেন না

বাবা। এরপর পুরোপুরি রেডি হয়ে বের হওয়ার সময় বলে গেলাম দাদির বাসায় যাচ্ছি। কিছু বললেন না তিনি।

রাস্তায় বের হয়ে এলাম। যখন বের হওয়ার কথা, তার কয়েক ঘণ্টা আগে চলে এসেছি। মাথাটা শূন্য হয়ে গেল হঠাৎ। কেমন যেন ঘোরের মধ্যে হাঁটছি আমি। বোনকে ফোন দিলাম। বলল আরেকটা ক্লাস করে দাদির বাড়ি চলে যাবে ও। আমি হাঁটতে লাগলাম। ফেসবুকের পরিচিত এক মুসলিম বোন ফোনে জানালো গাড়ি নিয়ে এদিকেই আসছে, আমাকে নিয়ে যাবে দাদির বাড়িতে। গাড়িতে উঠে দেখলাম বেশ কয়েকজন বোন বসে আছেন ভেতরে। কাউকে চিনি, কাউকে চিনি না। সবাই চলে এসেছেন আমার এই বিশেষ সময়ে সঙ্গ দিতে। অপরিচিত এক বিদেশি বোন আমার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা বোধহয় একেই বলে।

নার্ভাস? একটুও নার্ভাস নই আমি। মিথ্যা প্রবোধ দিলাম নিজেকে। এদিকে হাত পা হিমশীতল, মুখ-চোখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল।

দাদির বাড়ি পৌঁছে মেয়েরা আমাকে সাজানো শুরু করে দিল। কোনো অনুভূতি কাজ করছিল না তখন আমার। না দুঃখ, না আনন্দ। বরের মা, মায়ের বান্ধবী আর মামাতো বোন এলেন। এলেন আমার চাচা আর চাচি। পুরুষরা সবাই বাইরের ঘরে বসেছেন। কিছুক্ষণ পড়েই বিয়ে পড়ানো হবে। হঠাৎ আমার মোবাইলে ফোন এল। মা কল করেছে!

বার বার ফোন করেই যাচ্ছেন, আমি ধরছি না। এবার দাদির নাম্বারে ফোন দিলেন। দাদি কী বলবেন না বলবেন বুঝতে না পেরে আমাকে ধরিয়ে দিলেন ফোনটা। কেন হঠাৎ দাদির বাসায় গিয়েছি, কেন ফোন ধরছি না, কেন এত দেরি করছি ... প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কান্নাজড়িত কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারছি ঘটনা আঁচ করতে পেরেছেন মা। জানালার দিকে তাকালাম। বৃষ্টি পড়ছে অঝোর ধারায়।

- 'কেমন করে বাসায় ফিরব মা, বৃষ্টি হচ্ছে যে?'

- 'এক্ষুনি বাসায় যাও তুমি, এক্ষুনি। তুমি যার সাথে চাও তার সাথেই বিয়ে দেব তোমার। প্লিজ উল্টাপাল্টা কিছু করে বোসো না। প্লিজ বাসায় যাও।'

- 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে মা, অনেক দেরি!'

প্রথমবারের মতো দুচোখ ভিজে গেল আমার।

শায়খ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম বিয়ের খুতবা দিলেন। বাবার অনুপস্থিতিতে সেজোচাচা ওয়ালি হলেন। তিনি বিয়ের কাগজপত্র নিয়ে আমার কাছে এসে জানতে চাইলেন এই বিয়েতে আমার কোনো সমস্যা আছে কি না। মাথা নাড়লাম আমি, ‘না’। এভাবে ‘না’ বলার সাথে সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেল। অতঃপর কাগজে সাইন করলাম।

শাশুড়ির বান্ধবীর দেওয়া বোরখাটি পরে নিলাম। মুখে সাজ ছিল বলে কেউ একজন নিকাব পরিয়ে দিলেন। আমার স্বপ্নের পোশাক। আবারও যেন ঘোরের মাঝে চলে এলাম। কষ্ট করে দূর দূর থেকে আসা মুসলিম বোনদের কাছ থেকে কোনোরকম বিদায় না নিয়েই যন্ত্রের মতো বের হয়ে গেলাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। ব্যস্ত শহরের বর্ষণসিক্ত রাস্তায় ছুটে চলেছে আমাদের নিয়ে সাদা রঙ এর ছোট প্রাইভেট কারটি। চারপাশে সবার উচ্ছসিত কথার মাঝে নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি। কত বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে পেছনে ফেলে এসেছি আমার অতীত। সামনে রয়েছে অজানা অচেনা ভবিষ্যৎ। আমার নতুন জীবনের পথে নতুন যাত্রা শুরু হলো।

আমরা দুই বোন এক ভাই। আমার বড় বোন আমার দেড় বছরের বড়। কাছাকাছি বয়স হওয়ার কারণে আমরা একদম বান্ধবীর মতো ছিলাম। ছোট বেলা থেকে একসাথে পড়ালেখা করতে বসতাম, খেলতাম, আড্ডা দিতাম। ক্লাস থেকে এসে কার ক্লাসে কি হয়েছে না হয়েছে সব গল্প করতাম। ঝগড়া লাগলেও তা কিছুক্ষণ পরেই ভুলে যেতাম এবং এমনভাবে গল্প করতে থাকতাম যেন কিছুই হয়নি। আমাদের মাঝে অনেক মিল ছিল। আমাদের পছন্দ-অপছন্দও মিলে যেত অনেক।

আমরা ছোটবেলা থেকে খ্রিস্টান পরিবারে বড় হয়েছি। যদিও আমার বাবা আগে মুসলিম ছিলেন। কিন্তু আমার খ্রিস্টান মাকে বিয়ে করার জন্য তিনি চার্চে গিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্টান হলেও আমরা তাকে কখনোই ধর্ম পালন করতে দেখিনি। বাবা কখনো চার্চে যেতেন না, ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানেও যেতেন না খুব

একটা। তিনি মন থেকে খ্রিষ্টধর্ম না মানলেও ইসলাম ধর্মও তিনি পালন করতেন না। মানে সলাত পড়তেন না, যাকাত দেওয়া, সিয়াম রাখা ইত্যাদি কিছুই করতেন না। হয়তো সেকুলার মুসলিমদের মতো ভাবতেন যে জাহান্নামে কিছুদিন থাকতে হলেও শাস্তি শেষ হলে মুসলিমরা একদিন জান্নাতে যাবেই। তিনি 'যার যার ধর্ম তার তার' এই মর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।

তবে যেহেতু বাবা-মা দুইজনই খ্রিষ্টান, আমরাও ছোটবেলা থেকে খ্রিষ্টান হিসেবেই বড় হয়েছি। আমার দাদা-বাড়ির মানুষদের সাথে খুব কমই আমাদের দেখা হতো। মা চাকরি করতেন। ফলে প্রতি রবিবার আমরা চার্চে না গেলেও ক্রিসমাস, ইস্টার ঘটা করে পালন করতাম। নতুন জামা কেনা, রাতে চার্চে যাওয়া, খ্রিষ্টান আত্মীয়দের বাসায় ঘুড়তে যাওয়া সব মিলিয়ে অনেক আনন্দ করতাম।

২০০৭ সাল, তখন আমি অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী। নতুন ভার্সিটিতে উঠেছি, অন্যরকম এক অনুভূতি! সে সময় নিজেকে খুব বড় বড় লাগত। ভর্তি হয়েছি প্রাণরসায়ন বিভাগে। পছন্দের বিষয়। খুব আগ্রহ নিয়ে ক্লাস করতাম। ফ্যাশন করতে ভালো লাগত। চুল স্টাইল করে কাটা থাকত। ম্যাচিং কানের দুল, হাতে চুড়ি, চুলে ক্লিপ থাকত। রঙ-বেরঙের নেইল পলিশ দেওয়া আমার শখ ছিল। ক্লাসের ছেলে মেয়ে সবাইকেই আমি তুই তুই করে কথা বলতাম। যুক্তি ছিল, তুই-এর সম্পর্ককে অন্য দিকে নেওয়া এত সহজ না যতটা তুমি এর সম্পর্ককে অন্য কিছুতে নেওয়া সহজ। আমার ক্লাসে আমি ছাড়া শুধু একটি ছেলে খ্রিষ্টান ছিল। ধর্ম নিয়ে আমার কারও সাথেই তেমন কথা হতো না। যে যে যার যার ধর্ম নিজের মতো পালন করতাম। স্কুল-কলেজে থাকতেও ক্রিসমাসে যেমন আমার মুসলিম বন্ধুরা আমার বাসায় আসত, তেমনি আমিও ঈদে বান্ধবীদের বাসায় বেড়াতে যেতাম। আমাদের বাসার কাছেই বিভিন্ন পূজায় অনুষ্ঠান হতো। সেগুলোতেও সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতে যেতাম। আসলে ধর্ম ব্যাপারটা আমার কাছে সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল। পালন করতে হবে তাই পালন করা। আমার ধারণা ছিল, সৃষ্টিকর্তাকে যে যেভাবেই ডাকুক—পদ্ধতি ভিন্ন হলেও সবাই তো একই সত্তাকে ডাকছি। যখন কিছুর প্রয়োজন হতো প্রার্থনা করতাম, মূর্তির সামনে মানতি করে মোম জ্বালতাম। কাজটা ঠিক কী ভুল—এটা নিয়ে ভাবার কখনো সুযোগ হয়নি। আমার অমুক জিনিস লাগবে, এখন সবাই বলে এভাবে নাকি পাওয়া যায়। চেষ্টা করে দেখতে আর দোষ কী?

এভাবেই চলছিল দিন। একদিন আমার ক্লাসের এক ছেলে পড়ার ব্যাপারে আমাকে ফোন করে। বোন পাশ থেকে বলল জিজ্ঞেস করতে ওর কাছে কোনো ভালো বই আছে নাকি পড়ার মতো। ছেলেটা জানাল, ওর কাছে গল্পের বই নেই, সব আধ্যাত্মিক বই। বোন বলল সেখান থেকেই একটা বই দিতে। বইটা বাসায় এনে দুই তিন পাতা পড়লাম, তারপর আগ্রহ হারিয়ে টেবিলের ওপর ফেলে রাখলাম। এটাই আমার প্রথম ইসলাম সম্পর্কে কিছু পড়া। তবে আমি না পড়লেও বোন আমার ঠিকই বইটা পড়েছিল। ওকে কিছুদিন ধরেই দেখছিলাম বাইবেল পড়তে, বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করতে। আমি এগুলো ওর নিছক আগ্রহ হিসেবেই দেখতাম।

আমি আর আমার বোন একসাথে ভার্সিটির পড়া পড়তে বসতাম। ছোটবেলা থেকেই আমরা একসাথে পড়তাম। কিন্তু কিছুদিন ধরে লক্ষ করছিলাম যে ওর পড়ার ধরনটা একটু অন্যরকম। একদম সোজা হয়ে বসে সামনে বই রেখে বিড়বিড় করে পড়তে থাকত। ওর এভাবে পড়া নিয়ে আমি মজা করতাম ওর সাথে। এভাবে কেউ পড়ে! হাসাহাসি করতাম।

আমার বোন আমাকে বলত যে সব ধর্ম তো একসাথে সত্যি হতে পারে না, সৃষ্টিকর্তা সত্যি হলে একটা না একটা ধর্ম তো সত্যি হবেই। ওকে দেখতাম বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করত। বাসায় অনেক নতুন নতুন বই দেখতাম। আমি এসব বই কোনটাই পড়ে দেখতাম না। আমার ক্লাস, টিউশনি, বন্ধু-বান্ধবী ইত্যাদি নিয়েই নিজের মতো ব্যস্ত থাকতাম। তবে ও পড়ত এবং একসময় বলা শুরু করল যে ইসলামধর্মই আসলে সঠিক। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। বলত কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য আছে। গাছের গায়ে, জীব জন্তুর গায়ে ইত্যাদিতে আল্লাহর নাম লেখা বা পাথর গাছ ইত্যাদি সেজদা দিচ্ছে এমন ফটোশপ করা ছবি না, আসল মিরাকল। আমার সাথে বোন কুরআনের ভাষাগত, বৈজ্ঞানিক মিরাকল নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করত।

আস্তে আস্তে ওর কথা শুনে আমিও বিশ্বাস করতে শুরু করলাম যে ইসলামই সঠিক ধর্ম এবং আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর জন্য পাঠিয়েছিলেন। আমি জানতাম বোন আমার সাথে

কখনো মিথ্যা বলবে না। এবং ও যখন কিছু একটাকে সত্য বলবে, অবশ্যই জেনেশুনেই বলবে। তাই ও যা বলত, মেনে নিতাম। আর ওর কথায় তো যুক্তিও ছিল। আসলেই তো সব ধর্ম একসাথে সত্যি হতে পারে না। ওর যুক্তি শুনে ইসলামকেই সঠিক ধর্ম মনে হচ্ছিল। খ্রিষ্টধর্মের প্রতিও আমার আগ্রহ অনেক আগেই হারিয়েছিলাম।

আমি নাস্তিক কখনোই ছিলাম না, একজন সৃষ্টিকর্তা আছে বুঝতাম কিন্তু সেই মহান সত্তাকে চিনতাম না। তাই বোনের কথাতে মেনে নিলাম আল্লাহই সত্য এবং কিছু চাইতে হলে একমাত্র তাঁর কাছেই চাইতে হবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে বোনের কথা শুনে আল্লাহই আমাদের প্রভু—এটা মানলেও আমি তখনও সত্যিকার অর্থে ইসলাম কী তা বুঝিনি। সুন্নাত কী, কবীরা-সগীরা গুনাহ কী, হারাম-হালাল কী, জাহান্নাম বা কবরের শাস্তি, জান্নাতের পুরস্কার কিছুই ভালোমতো জানতাম না। শুধু মেনে নিলাম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং আমাদের যাবতীয় দুআ একমাত্র তাঁর কাছেই করতে হবে।

আসলে আমি মূর্তির কাছে দুআ করে কখনো মনে শান্তি পাইনি। আমাদের চার্চে যে যিশু বা মেরির মূর্তি ছিল তারা আমাদের মতোই মানুষ। যারা আমাদেরই মতো দেখতে তাদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ধরে নিলেও কোথায় জানি একটা 'কিন্তু' থেকেই যায়। বোন বলল, আল্লাহ এমন একজন সত্তা, যিনি অতুলনীয়, আমাদের থেকে একেবারেই আলাদা। তাঁকে এই পৃথিবীতে দেখা যাবে না তবে তাঁর সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা দেখে তার মহত্ত্ব বোঝা যাবে। খ্রিষ্টধর্মের চেয়ে স্রষ্টার সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ আমার কাছে বেশি সহজ ও যৌক্তিক মনে হয়েছিল।

এরপর থেকে দিন আগের মতোই কাটত শুধু বিশ্বাসটা বদলে গেল। সমস্যায় পড়লে দুআ করতাম আল্লাহর কাছে এবং আল্লাহর কাছে দুআ করে যে শান্তি পেতাম তা আগে আর কখনো পাইনি। আগে যখন মূর্তির কাছে প্রার্থনা করতাম, শুধু প্রার্থনা করতাম কিন্তু ভরসা থাকত না যে সেটার উত্তর আসবে। অনেকটা কারও কাছে চাইতে হবে বলে করা। কিন্তু আল্লাহর কাছে যখন দুআ করতাম বুঝতে পারতাম আল্লাহ, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমার দুআ শুনছেন। আশা, ভরসা, ভালোবাসা থাকতো দুআর সাথে। কিছু চেয়ে না পেলেও জানতাম যে এরচেয়ে ভালো কিছুই আল্লাহ আমার জন্য রেখেছেন। আল্লাহকে ভালোবাসি বলে মাঝে মাঝে একটু ইসলাম সম্পর্কে

পড়ার চেষ্টা করতাম, কিন্তু কেন যেন সেই পড়া বেশিদূর আগাত না। দুনিয়ার জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতাম।

আর আমাদের আশেপাশের মুসলিমদের থেকে আমরা ইসলাম কী তা কখনো শিখতে বা বুঝতে পারতাম না। সারাজীবনে বন্ধু-বান্ধবীদের পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়তে খুব কম দেখেছি। মাঝে-সাঝে দেখলেও, সলাত যে কতো দারুণ একটা ব্যাপার, আল্লাহর সাথে—আমাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে দিনে পাঁচ বার সরাসরি কথা বলা, তা আমি মুসলিমদের থেকে কখনো বুঝিনি। পর্দা করেও দেখতাম মেয়েরা প্রেম করে বেড়াচ্ছে, ছেলেদের সাথে আড্ডা দিচ্ছে। ভাবতাম শুধু চুল ঢাকাই বুঝি পর্দা করা।

তবে এটা ঠিক সলাত পড়ুক বা না পড়ুক, হারাম কাজ থেকে দূরে থাকুক বা না থাকুক, একটা জিনিস আমি সবার মাঝেই দেখতাম: আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা। তবে সত্যিকার অর্থে ইসলাম কী তা আমার কাছে অজানাই রয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ একদিন আমার বোন আমাকে জানাল যে সে মুসলিম হয়ে গেছে। সে ঘোষণা দিচ্ছে যে ইসলামই আসল ধর্ম ও সত্য ধর্ম। তখন আমিও জানালাম যে আমিও ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ও ইসলামগ্রহণ করেছে। এটা শুধু সরাসরি মুখে বলা। ওর থেকে জানলাম কালিমা পড়ার পর প্রথম কাজ হচ্ছে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা। যেহেতু মুসলিম হয়েছি এখন আমাদেরও সলাত পড়তে হবে।

সলাত যে পড়ব—আমি তো সূরাহ, সলাতের পদ্ধতি, দুআ কিছুই পারি না। এবং সবচেয়ে বড় কথা আমি আরবী পড়তেই পারি না। কারও থেকে যে শিখব সে উপায়-ও নেই। তখন ইন্টারনেটের একটা ওয়েবসাইটের কথা জানলাম ওর কাছ থেকে। মাউন্টহীরা! সেখান থেকে শুনে শুনে সূরাহ শেখা যায় খুব সহজেই। আমি ওর পড়া নিয়ে যে হাসাহাসি করতাম, তা আসলে ওর ইশারায় সলাত পড়া ছিল! তখন জানলাম ও যে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়ে তা না, তাহাজ্জুদের সলাতও পড়ে! আমাকে সে মুসলিম হয়েছে জানানোর অনেক আগে থেকেই ও সলাত, অযুর

নিয়ম-কানুন, সূরাহ, দুআ ইত্যাদি শিখে সলাত পড়াও শুরু করে দিয়েছে। ওর ঈমান যে কত গভীর তা সেদিন বুঝতে পারলাম।

এরপর থেকে আমি সময় পেলেই হেডফোনে ওই সাইট থেকে শুনে সূরাহ শিখতে লাগলাম। সারাদিন বাসায় কেউ না-কেউ থাকেই। দিনে আমিও ব্যস্ত থাকতাম। তাই রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে কম্পিউটারে বসতাম সূরাহ শিখতে। সারাদিন পর রাতে ক্লান্ত থাকতাম তাই খুব ধীরে ধীরে শিখছিলাম। আর আমি যেহেতু নিজে ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করিনি তাই সলাত পড়া যে তাড়াতাড়ি শিখতে হবে বা সলাত যে কত জরুরি সে সম্পর্কে তেমন ধারণাই ছিল না। এমনকি সলাত যে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলতে পারার একটা মাধ্যম সেটাও আমি সলাত পড়তে পারার অনেক পরে জেনেছি ও বুঝেছি।

বোন আমাকে বলেছিল মাউন্টহীরা থেকে সূরাহ শেখা যাবে, কিন্তু কোন কোন সূরাহ শিখতে হবে তা বলে দেয়নি। আমি প্রথমে আয়াতুল কুরসী শিখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে শিখে যখন অর্ধেক মুখস্থ করলাম তখন জানতে পেরে ও বলল, প্রথমে সূরাহ ফাতিহা শিখতে হবে, এটা না! আমি এত কষ্ট করে এতখানি মুখস্থ করলাম আর এখন বলে এটা না! কী আর করা, আয়াতুল কুরসী মুখস্থ করা মাঝপথে থামিয়ে সূরাহ ফাতিহা শিখতে লাগলাম।

সলাত পড়া শিখতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। সত্যি বলতে আমি ততটা সিরিয়াসও ছিলাম না। কিন্তু বোন সলাত পড়ত, আমি পড়তাম না, কেমন জানি লাগত। আস্তে আস্তে আমিও সলাতের জন্য প্রয়োজনীয় সূরাহ, দুআ সব মুখস্থ করে ফেললাম। কীভাবে সলাত পড়তে হয়, কোন ওয়াক্তে কয় রাকাত সলাত, কখন তাশাহুদ পড়তে হবে ইত্যাদি বোন আমাকে বুঝিয়ে দিল। ওযু কীভাবে করে সেটাও বলে দিল। ওযুর পদ্ধতি লেখা একটা শীট দিয়েছিল ও আমাকে পড়তে, কেউ দেখে ফেলতে পারে এজন্য আমার নোটের সাথে রেখেছিলাম ওটা। কিন্তু পরে কোন নোটের সাথে রেখেছি তা মনে করতে পারিনি। শেষমেশ বোন থেকে হাতে-কলমে শিখে নিলাম।

আগেই বলেছি, সারাদিন আমাদের বাসায় কেউ না-কেউ থাকত। বাবা বিজনেস করেন, বাসার কাছেই অফিস; তাই যখন ইচ্ছা বাসায় চলে আসেন। সন্ধ্যার পর

মা-ও বাসায় আসেন অফিস থেকে। আর দিনে আমার ক্লাস থাকে, টিউশনি থাকে। দিনে তাই সময় মতো সলাত পড়তে পারতাম না। রাতে সবাই ঘুমিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতাম। সবাই ঘুমিয়ে গেলে একসাথে সব ওয়াক্তের সলাত পড়ে ঘুমাতে যেতাম। সলাত পড়তে হতো ইশারায়। কারণ, আমাদের রুমে রাতে মা ঢুকে সলাত পড়তে দেখলে সমস্যা হয়ে যাবে। কতদিন এমন হয়েছে যে সলাত পড়ার মাঝখানে কেউ রুমে চলে এসেছে। তখন লাফিয়ে উঠে বই পড়ার অভিনয় করতাম। আমি সব সময় রাতে পড়ি। তাই কেউ সন্দেহ করত না। আর ঘুমের ঘোরে থাকত বলে খেয়ালও করত না। তবে এভাবে একসাথে এতগুলো সলাত পড়া কষ্টের ছিল। একদিন এমনও হয়েছে যে সলাত পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি নিজেও জানি না।

আমার নখ বড় ছিল। নেইল পলিশ দেওয়ার শখ ছিল। কিন্তু ওযু হবে না বলে নখ কেটে ফেললাম। সবাইকে বললাম, সামনে ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা। নখের যত্ন নিয়ে সময় নষ্ট হয় তাই কেটে ফেলেছি, পরীক্ষার পর আবার রাখব। কিন্তু পরীক্ষার পর আর রাখিনি নখ। তখন কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতাম যে মনের ভুলে দাঁত দিয়ে নখ কেটে ফেলি!

মজার ব্যাপার হলো, আমি সলাত পড়তাম, শখের নখ কেটে ফেললাম, কিন্তু তখনও আমি কুরআন পড়িনি, তেমন হাদীস জানা দূরে থাক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই ভালো ধারণা ছিল না। আমি ততটুকুই জানতাম যা বোন আমাকে বলত। ও বার বার না বললে, মনে হয় না এত তাড়াতাড়ি সলাত পড়তে, ওযু করতে শেখা হতো।

সলাতের পর এলো হিজাব করার পালা। মেয়েদের কেন পর্দা করতে হবে, না করার কুফল কী, কেন চুল ঢাকতে হবে—এ গুলো সবই শিখলাম বোনের কাছ থেকে। ইসলামে মেয়েরা অমূল্য সম্পদ। তাদের অনেক সম্মান দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের পর্দা করতে বলা হয়েছে যাতে তাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য সবার কাছে প্রকাশ না হয়। তাদের সৌন্দর্য রাস্তা-ঘাটের সবার জন্য না। তাকে দেখবে শুধু তার জীবনসঙ্গী।

পর্দা করলে অনেকে ভাবে মেয়েদের স্বাধীনতা নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আসলে পর্দা মেয়েদের অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করে এবং সম্মান এনে দেয়। চুল হচ্ছে মেয়েদের আসল সৌন্দর্য। এভাবে আগে ভাবিনি যে চুলের স্টাইল বদলের সাথে সাথে মেয়েদের চেহারাও বদলে যায় এবং ঠিক স্টাইলে চুল কাটলে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় অনেকখানি। তাই চুল ঢাকাটা আল্লাহ ফরয কেন করেছেন তা বুঝতে পারলাম।

আমার বোন আগে হাল ফ্যাশনের জামা পরত। মুসলিম হবার পরে ও বাসা থেকে খুব সাদাসিধে কাপড়ে বের হতো আর বাসা থেকে কিছুদূর গিয়ে মাথায় কাপড় দিত। ফুল হাতা ঢিলাঢালা কামিজ পরত। আমিও থ্রি কোয়ার্টার হাতা বা ফুলহাতা কামিজ পরতাম। কিন্তু মাথায় কাপড় দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি পিছিয়ে গেলাম। আমি গরম সহ্য করতে পারতাম না। বেশি গরমে থাকলে অসুস্থ হয়ে যাই। ক্লাসে মাথা ঘুরে পরে গিয়েছিলাম একবার। ফলে মাথায় কাপড় দেওয়াটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমার জন্য। কয়েকদিন চেষ্টাও করেছি কিন্তু গলা মাথা ঢেকে বেশিক্ষণ থাকতেই পারতাম না। মাথাব্যথা করত নাহলে মাথা ঘুরত। তাই মাথায় কাপড় দেওয়া একরকম ছেড়েই দিলাম। তবে আগের মতো ফ্যাশন করে চুল কাটা, ম্যাচিং চুড়ি, কানের দুল পরা—এসব ছেড়ে দিলাম। চেষ্টা করতাম নিজেকে যেন আকর্ষণীয় না লাগে।

মাথায় কাপড় দেওয়ার ব্যাপারে যে শয়তান আমাকে আটকিয়ে দিয়েছিল তা তখন বুঝিনি। ভেবেছিলাম যেহেতু অসুস্থ হয়ে যাই তাই নিজেকে আকর্ষণীয় না করলেই হবে।

মাহরাম, অ-মাহরাম সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা ছিল না আমার। বোন বলেছিল ছেলে-মেয়ের মেলামেশা ইসলাম অনুমোদন করে না। কিন্তু এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকার কারণে খুব একটা মানতাম না। আমার ক্লাসে আমরা মাত্র পাঁচটা মেয়ে। সবাই ছেলেদের সাথে মিশত। সবাই অনেকটা ভাই-বোনের মতো ছিলাম। হঠাৎ ছেলেদের সাথে কথা বন্ধ করে আলাদা হয়ে যাওয়াটা নিজের কাছে খুব অস্বাভাবিক লাগত। তবে আস্তে আস্তে ছেলেদের সাথে ফোনে কথা বলা কমিয়ে দিয়েছিলাম। যদি বলতেই হতো একা কথা বলতাম না। পাশে কাউকে রাখতাম। জন্মগত মুসলিম মেয়েদেরও দেখতাম খুব স্বাভাবিকভাবে ছেলেদের সাথে মেশে—তাই ব্যাপারটা

নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি। অল্প বিদ্যা অতি ভয়ংকর বলে যে একটা কথা আছে তা আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল বেশি। আমি নিজের মনমতো করে হারামকে হালাল করে নিয়েছিলাম; আস্তাগফিরুল্লাহ! না জেনে বা না বুঝে করা পাপের চেয়েও ভয়াবহ আল্লাহর বিধানকে নিজের সুবিধামতো বদলে নেওয়া, আল্লাহর কাছে এ থেকে মাফ চাই।

শয়তান নানা কিছু বোঝাত—ও তো আমার ভাই এর মতো, আমি তো খারাপ কিছু করছি না, সবার সামনেই আড্ডা দিচ্ছি, বা একসাথে পড়তে হলে কথা বলতেই হবে, কথা না বললে বরং আকর্ষণ বাড়ে ইত্যাদি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে আমার ক্লাসমেটদের মধ্যে কেউ কারও সাথে প্রেম করত না। ছেলেগুলো ভদ্র ও ভালো ছিল। ফলে শয়তানের কুমন্ত্রণা খুব সহজেই বিশ্বাস করেছিলাম।

আল্লাহ যখন কিছু একটা নিষেধ করেন তখন সেই কাজে কোনোভাবেই আমাদের কল্যাণ থাকতে পারে না। কারণ, সৃষ্টিকর্তার চেয়ে কে বেশি জানবে আমাদের জন্য কী ভালো, আর কী খারাপ। আল্লাহ আমাদের যা করতে বলেছেন সেটা করা, আর যা নিষেধ করেছেন—তা থেকে বিরত থাকা মানেই ইসলাম—আত্মসমর্পণ!

দেখতে দেখতে চলে এল পবিত্র রমাদান মাস! লুকিয়ে সিয়াম রাখাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আমাদের জন্য। একই বাসায় থেকেও না খেয়ে থাকতে হবে আবার তা কাউকে বুঝতে দেওয়াও যাবে না! নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। কিন্তু তাই বলে কী আর সিয়াম রাখব না! মুসলিম হয়েছি আর সিয়াম রাখব না—ভাবাই যায় না!

প্রথম সমস্যা—সেহেরি করা। আমাদের বাসার ধরনটা খুব অদ্ভুত ছিল—রান্নাঘরে যেতে হতো মা-বাবার রুমের মধ্য দিয়ে; আর আমাদের ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো বাথরুমে। সুতরাং ভাত-তরকারি পাওয়ার কোনো আশা নেই। পাউরুটি-কলা কিনে রাখলাম আমরা রুমে। রাতে সেহেরি তো হবে। এতেই আমরা খুশি। মা চাকরি করে। বাসায় মা-বাবা কেউ থাকে না সারাদিন। দুপুরে খেয়েছি কি না দেখার কেউ নেই। আর ভাই বাসায় থাকলেও এসব সে খেয়াল করে না। শুরু হলো সিয়াম রাখা। প্রথম প্রথম আমি ভাবতাম সিয়াম রাখলে থুতু গেলা যাবে না। সারাদিন একটু পর

পর বাথরুমে গিয়ে থুতু ফেলতে লাগলাম। পরে এক বন্ধু থেকে জানতে পারলাম যে থুতু ফেলা লাগে না এত।

প্রথম সিয়াম রাখার অনুভূতি যে কী দারুণ ছিল, কখনোই ভুলব না। প্রথমদিন আমার ইফতারের সময় টিউশনি ছিল। স্টুডেন্টের বাসায় যে চা-নাস্তা দিয়েছে তা দিয়ে ইফতার করলাম। সফলভাবে প্রথম সিয়াম রাখতে পেরেছি—কী যে খুশি লাগছিল ভাষায় বোঝানো যাবে না।

শুক্রবার মা-বাবা বাসায় থাকতেন, তাই ওইদিন সিয়াম রাখতে পারতাম না। একদিন বিকালে টিউশনি করে আসার সময় নানির বাসায় গেছি দেখা করত। নানি চা এনে দিলেন। খাব না বলতে পারি না কারণ নানির চা আমার প্রিয় নানি জানেন; না খেলে যদি সন্দেহ করে। সারাদিন কষ্ট করে সিয়াম থেকে বিকেলে ভেঙে ফেলতে হলো। আস্তে আস্তে কারও বাসায় যাওয়াই ছেড়ে দিলাম রমাদানে।

সেহেরি যে রোজ করতে পারতাম তাও না। যেদিন কিছু থাকত না পানি খেয়ে সিয়াম রাখতাম। রাতে লাইট জ্বালানো যাবে না বলে পিসির মনিটরের আলোতে আমরা সেহেরি করতাম। একদিন আমরা বনরুটি খাচ্ছি এমন সময় মা ঘরে ঢুকল। বোন পিসির সামনে ছিল, কী করবে বুঝতে না পেরে মনিটর বন্ধ করে দিল! তারপর আমরা খাবার লুকিয়ে ফেললাম। মা কী বুঝল জানি না তবে কোনো প্রশ্ন করেনি। ইফতারিতে খুব একটা সমস্যা হতো না। ইফতারির আগে রাস্তায় জ্যাম থাকে বলে মা ইফতারির সময় অফিস থেকে বের হতো। তাই ইফতারিতে ভাত খেতে পারতাম। কিন্তু মা যেদিন আগে বের হতো সেদিন ইফতারি আর করা হতো না। দুপুরে বোন ইচ্ছা করে কম ভাত রাঁধত যাতে হাঁড়ি দেখে মা ভাবে আমরা দুপুরে খেয়েছি। সেবারের রমাদানে দিন বড় ছিল। তবুও সিয়াম রাখছি এই আনন্দের কাছে ক্ষুধার কষ্ট গায়েই লাগত না। সেই রমাদান মাসটা অনেক স্পেশাল ছিল আমাদের জন্য। একেকটা সিয়াম রাখতাম আর অন্য একধরনের শান্তি অনুভব করতাম মনের মধ্যে! আলহামদুলিল্লাহ!!

বোন ধর্ম নিয়ে পড়ত আর অনেকের সাথে আলাপ করত, তাদের প্রশ্ন করত। সবাই সন্দেহ করতে লাগল যে আমরা খ্রিষ্টধর্ম থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। তা ছাড়া আমাদের ফুলহাতা কাপড় পরা, চার্চে যেতে না চাওয়া, আমাদের আচরণ, কথাবার্তায় পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে মায়ের মনে সন্দেহ জাগতে থাকে। তবে তখনও মা বোঝেনি যে আমরা মুসলিম হয়ে গেছি। বোনকেই সবাই বেশি সন্দেহ করত। আমি তখনও বোনের মতো অত জ্ঞান অর্জন করতে পারিনি ফলে ইসলামের ব্যাপারে কথা বলতাম না। ফলে আমার ওপর সন্দেহটাও ছিল কম। কিন্তু তাও মাঝে-সাঝে ধরা পড়ে যেতাম।

একটা ডায়েরিতে কিছু সূরাহ আর দুআ লিখে রেখেছিলাম পরে মুখস্থ করব বলে। কিন্তু ওটা কীভাবে যেন মায়ের হাতে পড়ল। মা কেন আমার ঘরে ঢুকে আমার ডায়েরি বের করেছিলেন জানি না। ওটা পড়ে অনেক রাগারাগি করেছিলেন মা, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি তখন ক্লাসে ছিলাম। বোন ফোনে মেসেজ করে জানানোর পরে বাসায় আসতে ভয় পাচ্ছিলাম। বাসায় আসার পরে অনেক বকা খাই ওটার জন্য।

বই পড়ার পাশাপাশি ইন্টারনেট ও পীস টিভি থেকে ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি ও শিখেছি। বই এর ক্ষেত্রে ড. মরিস বুকাইলির *বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান* বইটার কথা আমার বেশি মনে আছে। বইটা থেকে কুরআনের মিরাকল সম্পর্কে একটা ধারণা পাই।

মনে আছে এমন এক বইতে বোন কবরের আজাব আর জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে পড়ে আমাকে বলেছিল। সেখানে এত ভয়ংকর ভয়ংকর শাস্তির কথা লেখা ছিল যে তা শুনে আমি ভয়ে রাতে ঘুমাতে পারিনি কিছুদিন। আল্লাহ এত কষ্টের আর এত ভয়ংকর শাস্তি কীভাবে দিতে পারেন বুঝতে পারছিলাম না। আমার কাছে আল্লাহ পরম দয়ালু একজন যিনি মায়ের মতো বাচ্চাদের দোষ সহজেই ক্ষমা করে দেন। পরে বুঝেছি, স্রষ্টার শাস্তি তাঁর ন্যায়বিচারের প্রতিফলন। একটা খুব খারাপ লোক যে পৃথিবীতে অনেকগুলো খুন আর ধর্ষণ করেছিল—তাকে শাস্তি দেওয়ার

জন্য তো ভয়ংকর কিছুই দরকার। সব অপরাধীর শাস্তি সমান হয়ে গেলে সেটা তো আর ন্যায়বিচার হলো না।

আমি ইউটিউব থেকে বাবা আলী ও ইউসুফ এস্টেস এর লেকচার দেখতাম কিছু কিছু। ইউসুফ এস্টেসের ইসলামে আসার কাহিনী অনেক প্রভাবিত করেছিল আমাকে। উনার প্রতিটা লেকচার খুব ভালো লাগত। বাবা আলীর কথাগুলো শুনতে মজা লাগত, যদিও তিনি স্কলার নন তবুও নতুন ইসলামে আসা আমার জন্য বেশ কিছু শেখার ছিল সেখানে।

আমাদের ইসলাম শেখার উৎস ছিল অনেক—সবগুলোই যে ঠিক তা নয়। বই বা ওয়েবসাইট—বিভ্রান্ত হওয়ার অনেক উপকরণের মাঝ দিয়ে আল্লাহ আমাকে সঠিক পথটা দেখিয়েছেন। নয়তো বাংলাদেশের মুসলিমদের কাছ থেকে একজন অমুসলিমের দাওয়াত পাওয়ার উপকরণ সামান্যই। এ দেশে খুব কমই সঠিক ইসলাম পালন করা হয়। বাংলাদেশের মানুষ পীর, মাজার ইত্যাদি পূজা করে যা স্পষ্টত শিরক। নিজেদের মুসলিম বলে কিন্তু সলাত পড়ে না পাঁচ ওয়াক্ত।

সময়ের সাথে সাথে আমরা আবিষ্কার করি এমন কিছু মানুষ আছেন বাংলাদেশে। আস্তে আস্তে তাদের সাথে বোনের যোগাযোগ হতে থাকে। মুহাম্মদপুর আল-আমীন মাসজিদে সবার সামনে ঈমানের সাক্ষ্য নেওয়ার ব্যবস্থা করেন একজন চাচা। মনে আছে ওইদিন আমি প্রথম কামিজের সাথে মাথায় সুন্দর করে হিজাব পরেছিলাম। এমনিতে আমার গাড়িতে খারাপ লাগে, তার ওপর প্রথম হিজাব পরা। মাসজিদে যাওয়ার পথে গাড়িতে আমার মাথা ঘুরছিল, বেশ অসুস্থ লাগছিল।

আমরা মাসজিদের দ্বিতীয়তলায় গেলাম। শরীর খারাপ লাগছিল বলে প্রথমে একটা কোণে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম। যখন একটু সুস্থ বোধ করলাম, চারপাশে এত মানুষ দেখে লজ্জা লাগছিল। সবার মাঝে একটা খুশি খুশি ভাব। বেশ কিছু উপহার পেলাম আমরা।

এরপর ইমামের সাথে সাথে আমরা কালিমা পড়ি। আলহামদুলিল্লাহ সবার সামনে ইসলাম গ্রহণ করে কেমন যে লাগছিল বোঝাতে পারব না। মুসলিম হবার আনন্দ, বাসায় জানলে কী হবে তার ভয়, সামনের জীবনের কথা ভেবে উদ্বিগ্নতা, আবার অদ্ভুত এক শান্তির অনুভূতি ছিল মনে। সব মিলিয়ে মিশ্র এক অনুভূতি।

সেদিনের কথা কখনোই ভুলব না আমি। আমার তখনও অনেক জানা বাকি, বোঝা বাকি ইসলাম সম্পর্কে। জানতাম সবাই জানতে পারলে অনেক বড় পরীক্ষায় পড়তে হবে। অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। অনেক আত্মীয়কে হারাতে হবে। তবুও একবারও মনে হয়নি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আল্লাহর ওপর এত বেশি বিশ্বাস করেছি যে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারব না—এ চিন্তাটা কখনো মাথায় আসেনি। এখন বুঝি আল্লাহ যে আমাকে হেদায়েত দিয়েছেন এজন্য সারাজীবন সেজদায় পরে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিলেও তা কম হবে। ইসলামের স্বাদ যে কী তা যে পায়নি সে কখনোই বুঝবে না।

ইসলাম গ্রহণের পর সবচেয়ে কঠিন যে পরীক্ষায় আমাদের পড়তে হয়েছে তা হলো মাকে কষ্ট দেওয়া। আমরা জানতাম মা অনেক কষ্ট পাবেন, ভেঙে পড়বেন। কিন্তু মাকে তো আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন, তাকে খুশি করতে গিয়ে সৃষ্টিকর্তার থেকে তো আমরা দূরে যেতে পারি না। ইসলামে মা-বাবার গুরুত্ব অনেক। তাদের সকল কথা মান্য করতে বলেছেন আল্লাহ। তবে শুধু আল্লাহর বিরুদ্ধে যায় বা আল্লাহর আদেশ অমান্য করা হবে এমন কথা মানা যাবে না। তাই মা কষ্ট পাবেন জেনেও আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না।

তবে মা একা নন, আমরাও প্রচুর মানসিক কষ্টের মধ্যে থাকতাম। যাকে আমরা অনেক ভালোবাসি তাকে এভাবে জেনে-শুনে কষ্ট দেওয়ার মানসিক যন্ত্রণা যে কী তা বোঝানো যাবে না। সত্য একদিন সামনে আসবে জানতাম কিন্তু তার মুখোমুখি হবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না।

বোনের বিয়ের জন্য তখন বিভিন্ন জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসা শুরু হলো। ও বিয়ে করতে চাইত না বলে ওকে না জানিয়েই পাত্রী দেখানোর ব্যবস্থা করা হতো মাঝে মাঝে। কিন্তু খ্রিস্টান ছেলে তো ওর পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব না। খুবই মানসিক কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল ও।

আমরা আল-আমীন মাসজিদে যাই ২০০৯ এর জুন মাসের ২১ তারিখ, পরের মাসে সেদিন মাসজিদে থাকা এক ভাই বোনকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। সে মাসেই

বোনের সাথে সেই ভাইটা দেখা করে কথা বলে। বোন বিয়ের ব্যপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না। মাকে কষ্ট দেওয়ার কথা ভেবে খুবই মানসিক চাপে ছিল। আমি আমার সাধ্যমতো বোনকে বোঝাতে থাকি, সাহস দিতে থাকি।

আমরা এতদিন যে ভয় পাচ্ছিলাম তার সম্মুখীন হওয়ার সময় আসল। বোন মুসলিম ছেলেকে বিয়ে করতে চায় জেনে মা অনেক কষ্ট পান এবং পরে তা রাগে পরিণত হয়। বোনের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন তিনি। দিন রাত শুধু কাঁদতেন। অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে দেখে বোন বাসায় বলে দেয় যে ও মুসলিম হয়েছে। কিন্তু সবাই ভেবেছে যে ওই ছেলেকে আগে থেকে পছন্দ করত এবং তাকে বিয়ে করবে বলে মুসলিম হয়েছে। কেউ যে সত্য ধর্ম খোঁজার অভিযানে নেমেছিল এবং তারপর ইসলামকে আবিষ্কার করে মনেপ্রাণে নিজের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছে এটা কেউ চিন্তাও করতে পারত না।

বোন যাতে ইসলাম মানতে না পারে সেদিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করল সবাই। সবাই ভাবত ভাইয়াকে ভুলে গেলে ও ইসলামকে ভুলে যাবে। বোনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জোর করে তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ইসলামের প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহর ইবাদত করা বন্ধ করে দেওয়া যায় না। প্রচুর মানসিক কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছিল ওকে।

মা-ও অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন, অনেক কান্নাকাটি করতেন। বোন না পারছিল মায়ের কষ্ট দূর করতে, না পারছিল ইসলামের পথ ছাড়তে। বোন শুকিয়ে কালো হয়ে গিয়েছিল।

আমার কথা কেউ সন্দেহ করেনি বলে আমাকে তখন এই যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। তবে বোনের অবস্থা দেখে খুব কষ্ট লাগত। মা যখন আমার কথাও জানবেন তখন যে কী হবে আল্লাহই জানেন!

আমি নিজেও মানসিক কষ্ট পাচ্ছিলাম। আগেই বলেছি কারও ধারণাও ছিল না যে আমরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছি। সবাই ভাবত হয় বোন ব্রেইনওয়াশড হয়েছে না হয় প্রেমে পড়েছে। বোন না হয় বিয়ে করে ইসলাম পালনের সুযোগ পাবে কিন্তু আমি? আর মায়ের কষ্ট কমানোর জন্যেও তো কাউকে তার সাথে থাকা লাগবে। তাই আমার মুসলিম হওয়ার কথা আর প্রকাশ করিনি কারও কাছে। খ্রিস্টান সেজেই

থাকতে লাগলাম সবার সাথে।[২৮] খুব সাবধানে সলাত পড়তাম। বাসার সব ইসলামী বই লুকিয়ে ফেলেছিলাম।

মাকে কোনোভাবেই মুসলিম ছেলের সাথে বোনের বিয়ের জন্য রাজি করানো গেল না। বোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছিল না কি করা উচিত এখন। অনলাইনে পরিচিত কিছু আপু ওকে সৎ পরামর্শ দিত। অনেক আলাপ আলোচনার পর ঠিক হলো মা-বাবাকে না জানিয়েই বোনের বিয়ে দেওয়া হবে।

ছেলে পক্ষ থেকে বিয়ের টুকটাক কিছু কেনা হলো। আমিও টিউশনির টাকা থেকে টুকটাক কিছু শপিং করলাম ওর জন্য। বিয়ের আগের দিন খুব বৃষ্টি ছিল, বৃষ্টির মধ্যে আমরা দুই বোন শেষবারের মতো ঘুরতে বের হলাম। বসুন্ধরা সিটিতে ইফতার করলাম একসাথে।

বোনের বিয়ে হয়ে যাবে, ও দূরে চলে যাবে সবই জানতাম কিন্তু সব এত দ্রুত হচ্ছিল যে কখন কীভাবে কী হয়ে যাচ্ছে বুঝে উঠতেই পারছিলাম না। যেন সব আগে থেকেই পরিকল্পনা করা। আল্লাহ কখন কী হবে সব ঠিক করে রেখেছিলেন।

আমি কলেজ থেকে গিয়েছিলাম দাদির বাসায়। খুব দ্রুত বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়ের পর পরই ওকে নিয়ে ভাইয়ারা তাদের বাসায় চলে গেল। ওকে ঠিকমতো বিদায়ও জানাতে পারলাম না। ওরা চলে যাওয়ার পর আমি বাসায় চলে আসলাম।

বাসায় আসার পর হঠাৎ করেই কেমন জানি খালি খালি লাগছিল। বোন যে চলে গেছে—এই অনুভূতিটা বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে দিচ্ছিল। ছোট থেকে একসাথে বড় হওয়া আমরা আর আগের মতো একসাথে পড়তে বসব না, একসাথে রাত জেগে গল্প করা হবে না। কলেজ থেকে এসে সারাদিনের কাহিনি শোনার কেউ থাকল না। লুকিয়ে সলাত পড়া, সাহরী খাওয়া—একসাথে আর করা হবে না। বোন ওর জীবন নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। আমি একা! কান্না আসতে লাগল। অনেক কান্না। জীবনে বোধহয় প্রথমবার এত কাঁদলাম। মা বাসায় এলে, সবাই জানতে পারলে কী হবে—এসব মাথায় নেই। কষ্টের কান্নাতে সব আতঙ্ক ধুয়ে গিয়েছিল।

---

২৮ অনেক আলিমের মতে এভাবে ইসলাম গোপন শুধু সেই পরিস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য যেখানে জীবননাশের ভয় আছে। - সম্পাদক।

বেলা গড়াল। বাবা-মা খবর পেয়ে বাসায় এলেন। এসে দেখলেন বোন নেই। তারা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না আমার বোনের মতো ভালো একজন মেয়ে পালিয়ে বিয়ে করার মতো গর্হিত কাজ করতে পারে। মা চিঠিটা পেলেন। এখানে ওখানে ফোন করে ঠিকানা যোগাড় করলেন। তারপর বোনের শ্বশুরবাড়ি ছুটে গেলেন।

সন্তানের প্রতি ভালোবাসার কাছে তাদের আত্মসম্মানবোধ হার মানল। কিন্তু মা অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। সারাদিন কাঁদতেন। আপন কেউ মারা গেলে যেভাবে কাঁদে, সেভাবে হাউমাউ করে কাঁদতেন। বোনের জামা-কাপড়, যে বালিশে ঘুমাত—এসব বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন। মা বোনকে খুব বেশি বিশ্বাস করতেন। বোন মায়ের অনেক কাজ করে দিত, মায়ের সেবা করত অনেক। এত আস্থার বড় মেয়ে যে এভাবে মাকে ফেলে চলে যাবে—মা কল্পনাও করতে পারেনি। এতটা কষ্ট পেলেও মা রোজ বোনকে ফোন করে ওর খোঁজ নিতেন। ওর বাসায়ও যেতেন ওকে দেখতে। মায়েদের ভালোবাসা এমনই হয়।

বোনের বিয়ে হওয়ার পর থেকেই আমার আসল পরীক্ষা শুরু হলো। মা রোজ কাঁদতেন আর বলতেন, ‘তোমার বোন আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তুমি এমন কষ্ট দিয়ো না, তাহলে আমি মারা যাব।’ আমার কিছুই বলার থাকত না। চুপ করে শুনতাম। সব আত্মীয়রাও একই কথা বলত। অথচ মনে মনে আমি মুসলিম—মায়ের কথামতো খ্রিস্টান কোনো ছেলেকে বিয়ে করতে পারব না। অর্থাৎ আমাকেও মায়ের অবাধ্য হতে হবে। না পারতাম মাকে কথা দিতে, না পারতাম মায়ের কষ্ট সহ্য করতে। এর ফল হলো ভয়াবহ। আস্তে আস্তে আমি ডিপ্রেশনে ভুগতে শুরু করলাম। বোন আমার কষ্ট বুঝত, কিন্তু কিছুই করার ছিল না।

আমি সবার থেকে দূরে দূরে থাকা শুরু করলাম। আত্মীয়দের বাসায় কম যেতাম। ক্লাস থেকে দেরি করে বাসায় যেতাম। ক্যাম্পাসে বসে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। যেদিন বন্ধু-বান্ধবীরা থাকত না এই দুপুরে রাস্তায় হাঁটতে থাকতাম। বাসায় যেতে ইচ্ছা করত না।

এদিকে ইসলামও শেখা হচ্ছিল না। আমার মুসলিম হওয়ার ব্যাপারটা কেউ যেন না জানে সে চেষ্টা করতাম। সব ইসলামী বই লুকিয়ে রেখেছিলাম। আসল জীবন কিংবা ইন্টারনেটের জীবন—কোথাও আমার তেমন কোনো ভালো মুসলিমা বান্ধবী ছিল না যে সাহায্য করবে। বোন নতুন সংসার নিয়ে ব্যস্ত। ইসলাম শিখতে গেলেই মায়ের কথা মনে হতো। আবার মায়ের ইসলামবিরোধী কথা শোনাও ছিল যন্ত্রণার। অসম্ভব মানসিক কষ্টে থাকতাম প্রায় প্রত্যেকটা মুহূর্ত।

মা ঘরের দরজা লাগাতে দিতেন না। তাই রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে একসাথে সব ওয়াক্তের সলাত পড়তাম। নিজেকে খুব ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করতাম। ক্লাস, পড়াশোনা, টিউশনি শেষে রাতে ২-৩ ওয়াক্তের সলাত পড়েই ক্লান্ত হয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়তাম। সলাতে অনিয়মিত হতে থাকলাম। ইসলাম থেকে দূরে থাকার ফলে ঈমানও কমতে লাগল।

মাঝে-সাঝে বোনের বাসায় যেতাম। ওই সময়টুকু খুব ভালো থাকতাম। পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়তাম। মাথায় কাপড় দিয়ে থাকতেও একটুও কষ্ট হতো না। ওদের বাসার সবাই আমাকে অনেক আদর করত।

ভাইয়া হাজ্ব করতে গিয়েছিলেন। কুরবানীর ঈদের কয়েকদিন আগে থেকে ঈদ পর্যন্ত ওদের বাসায় থেকেছিলাম। ঈদ যে আসলে কেমন হয় প্রথম বুঝলাম ওদের বাসায় ঈদ করে। ঈদের আগেরদিন সবাই মিলে গল্প করতে করতে চালের আটার রুটি বানালাম। ঈদের দিন কুরবানী দেওয়া, গোশত ভাগ করা ইত্যাদি অনেক কাজ। প্রথম ভুঁড়ি সাফ করা শিখলাম হাতে কলমে ভাইয়ার আম্মার কাছ থেকে। ডিপ্রেশনের কথা ভুলেই যেতাম বোনের সাথে থাকলে।

বাসায় আসার পর আবার শুরু হতো সেই পুরোনো কষ্ট। বোন কী সুন্দর ইসলাম পালন করতে পারছে আর আমি পারছি না। সলাতটাও পড়তে পারছি না, পর্দা করা, কুরআন তেলাওয়াত শেখা ইত্যাদি তো দূরের কথা। ইসলাম শেখার বেশ কিছু হালাকা, অর্থাৎ পাঠচক্র হয় ঢাকাতে। ইচ্ছে থাকলেও সেখানে যেতে পারতাম না। আমাকে খুব চোখে চোখে রাখতেন মা। বাইরে গেলেই ফোন আর ফোন না ধরলে রেগে যেতেন। হালাকাগুলোর বেশিরভাগ বিকেলে যখন আমার ক্লাস থাকে

না। আর আমাকে ফোনে না পেলে বন্ধু-বান্ধবীদের ফোন করলেই জেনে যাবে যে ক্লাস নেই তাও আমি বাসার বাইরে।

বোন আর আমার মাঝে কত মিল সবাই জানত এবং ভয় পেত আমিও মুসলিম হয়ে যেতে পারি। তবে আমি বোনের মতো ধর্ম নিয়ে বেশি কথা বলতাম না দেখে তারা খুব বেশি সুযোগ পেত না। পরোক্ষভাবে আমাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলত। এই সময়ে ডিপ্রেশনের পাশাপাশি নতুন আরেকটা সমস্যা শুরু হয় আমার—একা থাকতে পারতাম না। একা হলেই মাথায় দুনিয়ার দুশ্চিন্তা আসত। রাতে ভালো ঘুম হতো না, ছটফট করে কাটিয়ে দিতাম। ইসলাম পালন করতে পারছি না ঠিকমতো, আল্লাহ যদি নারাজ হয়? ভয় লাগত। আবার পালন করতে গেলে যদি মা জেনে যায়? আমি কোথায় যাব, কীভাবে সব সামলাব এসব ভেবে কূল পেতাম না। মা যে কষ্ট পাবেন তা আমি সহ্য করব কীভাবে?

মায়ের সামনে কম যেতে লাগলাম। মা অনেক বলত অফিস থেকে আসলে যেন মায়ের সাথে একটু গল্প করি, একসাথে টিভি দেখি। কিন্তু আমি মায়ের কাছে যেতাম না। জানি বোনের কথা উঠবেই আর আমি যেন এই কাজ না করি বলবেই। মা আমাকে বলতেন কথা দিতে যে আমি বোনের মতো করব না। কিন্তু মাকে মিথ্যা আশা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই মায়ের সাথে কম সময় কাটাতাম।

যখন কিছু করার থাকত না, গল্পের বই পড়ে বা নেটে বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে রাত জেগে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতাম। যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে নিজ থেকে চোখ বন্ধ হয়ে আসত, ঘুমানোর চেষ্টা করতাম না।

মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল এভাবে। সবাই ভাবত আমি অনেক হাসিখুশি আছি। কেউ বুঝত না আমার ভেতরে কী চলছে। নিজের সাথে যুদ্ধ করে করে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আর ঈমানও প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। সলাত পড়তাম, আবার ছাড়তাম। মাঝে মাঝে মাথায় কাপড় দিতাম, মাঝে মাঝে দিতাম না। আমি সুখী ছিলাম না। সারাক্ষণ মাথার মাঝে ঘুরত যে আমি মুসলিম হয়েও ইসলাম পালন করছি না। কোনো কিছুতেই শান্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। টিউশনি করে

মাসে ভালোই টাকা আয় করতাম, পড়ালেখায়ও খারাপ ছিলাম না। দুনিয়াবি কোনো জিনিসের অভাব ছিল না। তবুও মনে শান্তি ছিল না।

একদিন দুপুরে বাসায় ছিলাম। কী ভেবে খুঁজে একটা বাংলা কুরআন বের করলাম। বোনের ছিল কুরআনটা। ওযু করে কুরআন নিয়ে বসলাম। সূরাহ আল-বাকারা পড়তে লাগলাম। যতই পড়তে লাগলাম হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে লাগল। যখন সাত নম্বর আয়াতটা পড়লাম কান্না আটকাতে পারলাম না আর।

আল্লাহ তাদের মন ও শ্রবণ-শক্তির ওপর 'মোহর' অঙ্কিত করে দিয়েছেন। এবং তাদের দৃষ্টিশক্তির ওপর আবরণ পড়েছে; বস্তুত তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

আল্লাহ চাইলে আমার মনের ওপর মোহর মানে সিলগালা করে দিতে পারতেন, তাহলে আমাকে জাহান্নামের আগুন হতে কেউ রক্ষা করতে পারত না। কিন্তু আল্লাহ তা করেননি। আমি ঠিকমতো সলাত পড়ি না, পর্দা করি না, তাও তিনি আমাকে সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন! আল্লাহু আকবর! আর আমি কিনা তাও আল্লাহ থেকে দিন দিন দূরে চলে যাচ্ছি! যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত এতদিনে, আল্লাহকে আমি কী জবাব দিতাম? কী মুখ নিয়ে তাঁর সামনে যেতাম! সঠিক পথের সন্ধান পাওয়ার পরেও, সত্য জানার পরেও কীভাবে আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করে, আল্লাহর ইবাদাত না করে থাকতে পারছি! কাঁদতে কাঁদতে দুআ করতে লাগলাম, আল্লাহ আমার মনের ওপর মোহর অঙ্কিত করে দিয়ো না কখনো। আর আমার মায়ের মনের ওপর মোহর অঙ্কিত করে থাকলে তা সরিয়ে দাও। আমাকে যেভাবে হেদায়েত দিয়েছ, আমার মাকেও হেদায়েত দাও। আমি যদি জান্নাতে যেতে পারি আমার মা যেন আমার পাশে থাকে।

অনেক কেঁদেছি সেদিন। কাঁদতে কাঁদতে আরও পড়তে লাগলাম। এই ডিপ্রেশন থেকে বের হওয়ার উপায় খুঁজতে লাগলাম। সুরা আল-বাকারার ৬২ নাম্বার আয়াতে এসে আবার কেঁদে দিলাম।

নিশ্চয়ই মুসলিম, ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায়, (এদের মধ্যে) যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ভাল কাজ করে,

তাদের জন্য তাদের রবের নিকট পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন প্রকার ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

আলহামদুলিল্লাহ! এতদিনের ডিপ্রেশন ওই এক মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল। আল্লাহ নিজে বলেছেন আমার কোনো ভয় বা চিন্তার কারণ নেই। তাহলে কী জন্য আমি হতাশ হব? আমি সব সময় দুআ করতাম—যেন মাকে না জানিয়ে বিয়ে করা না লাগে আমার। মা যেন আমার বিয়েতে উপস্থিত থাকেন। খুশিমনে মুসলিম ছেলের সাথে আমার বিয়ে দেন। এত দিন দুআ করতাম আর এখন বিশ্বাস করা শুরু করলাম যে আল্লাহ চাইলে তা-ই হবে! আবার সলাত পড়া শুরু করলাম। মাথায় কাপড় দিতে তখনও সমস্যা হতো তবুও চেষ্টা করতে লাগলাম। অযথা অনলাইনে আড্ডা দেওয়া কমিয়ে দিতে দিতে বন্ধই করে দিলাম।

নিজেকে এতই ব্যস্ত করে ফেলেছিলাম যে নিজের জন্যই সময় ছিল না আমার। তবুও ইসলাম নিয়ে পড়া শুরু করলাম আবার। ধীর গতিতে আগালেও এবার আর পথভ্রষ্ট হতে হয়নি। এবার আমার বিশ্বাস ছিল আমি একা নই। আমার কথা বলার ও শোনার জন্য একজন আছেন। আমার আল্লাহ আমার সাথে আছেন। যখনই কষ্ট লাগত সেজদায় আল্লাহকে সব বলতাম। খুব আপনদের সাথে যেভাবে মানুষ কথা বলে আল্লাহর সাথে সেভাবেই কথা বলতাম। মন হালকা হয়ে যেত। কোনো কষ্টকেই আর কষ্ট মনে হতো না। আলহামদুলিল্লাহ!! আবার আমি নিজেকে ফিরে পেলাম!

২০১২ সাল, কিছুদিন পরেই রমাদান মাস শুরু হবে। নিয়ত করে রেখেছি এবার যত বাধাই আসুক সব সিয়াম রাখতে চেষ্টা করব। কুরআন তেলাওয়াত করতে পারতাম না বলে ঠিক করলাম বাংলা অনুবাদ পুরোটা পড়ে শেষ করব। তারাবির সলাত পড়ব প্রতিদিন। কী কী দুআ করব, কী কী আমল করব অনেক কিছুই পরিকল্পনা করে রেখেছিলাম। এমনকি শাবান মাসে কয়েকটা সিয়াম রেখে অভ্যস্ত করে নিলাম শরীরটাকে যাতে রমাদানে কষ্ট না হয়।

রমাদান মাসের আগের দিন হঠাৎ করেই প্রচণ্ড জ্বর উঠল। ১০৩ এর নিচে জ্বর নামেই না। সারারাত জ্বরে ছটফট করলাম। তিনটার দিকে যাও একটু ঘুমালাম, হঠাৎ সবার 'চোর এসেছে, চোর এসেছে' ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে দেখি চার তলার জানালা দিয়ে চোর আমার প্রিয় মোবাইলটা নিয়ে গেছে! মন খারাপ হয়ে গেল।

পরের দিনও জ্বর কমে না। ডাক্তারের কাছে গেলাম, টেস্ট করে ধরা পরলো আমার জন্ডিস হয়েছে। ডাক্তার আরও টেস্ট দিলেন, ধরা পড়ল হেপাটাইটিস এ ভাইরাস।

জন্ডিস হয়েছে—সিয়াম তো রাখতেই পারব না, এত পরিকল্পনা, এত প্রস্তুতি কিছুই আর কাজে লাগাতে পারছি না। মন ভেঙে গেল। দিন রাত কাঁদতাম। সুস্থ হবার নাম নাই এদিকে রমাদান মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে! হেপাটাইটিস এ এর চিকিৎসা হলো মানসিক ও শারীরিক বিশ্রাম। শারীরিক বিশ্রাম ঠিকই ছিল কিন্তু মানসিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। কোথায় সুন্নাতসহ সলাত পড়ব, তারাবি পড়ব, সেখানে ফরজ সলাত কোনো রকমে ইশারায় পড়তে হচ্ছে। কিছু খেতে পারতাম না।

বাবা-মা চিকিৎসার কোনো ত্রুটি রাখেননি। তাও রমাদানের শেষের দিকে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম যে স্যালাইন দেওয়া লেগেছে তিনটা। ডাক্তার বার বার বলতেন, কী নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করি যে অবস্থা দিন দিন এভাবে খারাপ হচ্ছে? সবাইকে বলতাম সামনে ফোর্থ ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা, পড়তে পারছি না তাই টেনশন হচ্ছে।

রমাদান মাস শেষ হয়ে গেল, কিছুই পরিকল্পনামতো করতে পারিনি। পরের রমাদানে বেঁচে থাকব কি না জানি না। মোবাইলটাও ছিল না যে নেট থেকে ইসলামী লেকচার পড়ব বা শুনব। পুরো রমাদান হাসপাতাল আর আমার ঘরের মধ্যে থেকেই কেটে গেল। আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তুস্ট থাকলাম। প্রায় দুই মাস ভুগে এরপর সুস্থ হলাম।

একা সারাদিন থাকাতে চিন্তা করার অনেক সুযোগ পাই। অতীতে কী ভুল করেছি, হেদায়েত পাওয়ার পরেও কী ভুল করেছি সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। নিজের মাঝে কী কী পরিবর্তন আনতে হবে ঠিক করলাম। সেই রমাদান মাস আমার জন্য অনেক বড় শিক্ষা ছিল। যখন সুযোগ পেয়েছি তখন সলাত পড়িনি, পর্দা করিনি, কত গুনাহে লিপ্ত ছিলাম। পরিকল্পনা করলেও আল্লাহ সামর্থ্য না দিলে কিছুই করা সম্ভব না। বুঝলাম শুধু চিন্তা করলে হবে না, সেটা করার সামর্থ্যও আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। বুঝলাম খ্রিষ্টধর্ম থেকে হেদায়েতের মতো এত বড় রহমতকে এত সস্তা হিসেবে নিলে হবে না। হতে পারে আমার পূর্বের গুনাহ মাফ হয়ে গেছে কিন্তু এখনকার গুনাহর কী হবে? সব কিছু জেনে-বুঝে পাপ করলে শাস্তি তো পেতেই হবে। কবরের আজাব, জাহান্নামের আগুন থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? একটা

একটা করে ভুল সংশোধন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলাম। ভুলের জন্য তওবা করে নিলাম।

১০.

সময় খুব ভালো কাটছিল। সারাদিন টিউশনি করতাম। স্টুডেন্টদের সাথে থাকতে নিজেকেও বাচ্চা মনে হতো, যেন আমিও আবার ছোট হয়ে গেছি। সময় পেলেই হয় ভার্সিটির বান্ধবী, নাহলে বোনের বাসায় চলে যেতাম। এই দুইজনের সাথে থাকলে হাজার মন খারাপ হলেও তা ভালো হয়ে যেত। বোনের দুই ছেলে যেন দুটো পুতুল! ওদের সাথে থাকলে দিন কীভাবে চলে যেত বুঝতেও পারতাম না।

অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করে ইউনিভার্সিটি অফ ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভে জেনেটিক এনজিনিয়ারিং এ মাস্টার্স এ ভর্তি হলাম। মজা লাগত খুব পড়তে। মাঝে একটা স্কুলেও পড়াই কিছুদিন। সময় কেটে যাচ্ছিল ভালোই আলহামদুলিল্লাহ। ডিপ্রেশন আর ছিল না। ইসলাম পালন করার প্রতি দিন দিন আরও বেশি সচেতন হচ্ছিলাম। তবে মাঝে মাঝে নিজেকে একটু একা লাগত। সব মেয়ের মতো আমিও স্বপ্ন দেখি নিজের সংসারের। মাস্টার্স করছি, বয়সও তো কম হলো না!

২০১২ এর শেষের দিকে, নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে একদিন ঠিক করলাম এখন থেকে চেষ্টা করব সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর পথে চলার। প্রথমেই ফেসবুক থেকে খুব পরিচিত আর হাতে গোনা কয়েকজন ইসলাম নিয়ে লেখে এমন ভাইদের বাদ দিয়ে সব ছেলেদের আনফ্রেন্ড করে দিলাম। আগে ফেসবুক ব্যবহার করতাম চ্যাট করতে কিন্তু এবার ইসলাম জানার কাজে লাগালাম। ইসলাম সম্পর্কে জানে, লেখালেখি করে এমন বোনদের খুঁজে খুঁজে বন্ধু হওয়া শুরু করলাম। বিশুদ্ধ কয়েকটি ইসলামী ফেসবুক পেইজের নাম জোগাড় করলাম বোনের থেকে। সেসব পেইজের পোস্ট প্রতিদিন পড়তাম। বোনের বাসা থেকে বই এনেও পড়তাম। বাসায় বোনের ইসলামী বইগুলো খুঁজে বের করলাম। আরও বেশি জ্ঞান অর্জনের দিকে মনোযোগ দিলাম।

নিজেকে অনেকটাই বদলে ফেললাম। আর তখনই আমার জীবনের আরেকটি বড় ঘটনার সূচনা হলো! আমার ফ্রেন্ডলিস্টে একজন ছিলেন, যাকে ইসলামী পোস্টের জন্য অ্যাড করেছিলাম আরও আগে। তবে কথা হতো না তার সাথে। তিনি আমার

ফেসবুক স্ট্যাটাস পড়ে যখন জানতে পারলেন আমি ধর্মান্তরিত মুসলিম; ম্যাসেজ পাঠিয়ে একজন ভদ্রমহিলার সাথে যোগাযোগ করতে বললেন। তিনি নাকি আমাকে ইসলাম পালনে সাহায্য করতে পারবেন।

অ্যাড করলাম আন্টিকে। ভালো লাগত উনার সাথে কথা বলতে। আন্টি সৌদি আরবে থাকেন। তিনি আমার ও বাসার অবস্থা বিস্তারিত জেনে নিলেন ও বললেন আমার জন্য ছেলে দেখবেন। প্রায়ই তার সাথে চ্যাটে কথা হতে লাগল। আমিও তাঁর সাথে আমার সকল সমস্যা নিয়ে আলাপ করতাম। একদিন তিনি আমার জন্য বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসলেন। তিনি ছেলের বর্ণনা দিতে লাগলেন—ছেলে ধার্মিক, পরিবার ভালো ইত্যাদি। কিন্তু যতবার প্রশ্ন করতাম ছেলে কী করে, নাম কী, তিনি কথা এড়িয়ে যেতে লাগলেন। আমি উনার কথা শুনছিলাম আর হাসছিলাম মনে মনে। ওই ভাই কেন আমাকে ওই আন্টির খোঁজ দিয়েছিলেন তা পরিষ্কার হয়ে গেল।

আমি আমার বিয়ের পাত্র খোঁজার দায়িত্ব দুলাভাইকে দিয়েছিলাম। আন্টিকে বললাম আগ্রহী ভাই যেন দুলাভাইয়ের সাথে কথা বলেন। ভাইয়ার পছন্দ হলে এরপর আমি কথা বলব। দুলাভাই তাঁকে বেশ পছন্দ করলেন। কথায় কথায় বের হয়ে গেল তাঁর ছোট বেলার বন্ধু আমার চাচাতো বোনের স্বামী। ভাইয়া আমাদের সামনাসামনি কথা বলতে বললেন। এক সপ্তাহ পর বোনের বাসায় দেখা করব ঠিক হলো।

এই এক সপ্তাহে আমি আন্টির কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে মোটামুটি যা জানার জেনে নিলাম। তাঁর মা-বোন আমার ছবি ও বায়োডাটা দেখে পছন্দ করলেন। দেখা করার আগে ইসতেখারার সলাত পড়ে আল্লাহর কাছে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সাহায্য চেয়ে নিলাম।

এক সপ্তাহ পর শুক্রবার জুমআর সলাতের পর ভদ্রলোক আসলেন বোনের বাসায়। সাথে আমার চাচাতো বোন এবং তার স্বামী। আর আমার জন্য একটা বই *আদর্শ নারী* ও চকলেট নিয়ে এসেছিলেন। যখন সামনে গেলাম কথা বলতে, তিনি আমাকে প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন যে আমার দৃষ্টিতে বিয়ে মানে কী! আমার মাথা তখন পুরো ফাঁকা। কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে ছিলাম। আমি অনেক আবেগী তা তিনি আন্টির থেকে জানতে পেরেছিলেন। এরপর আমাকে আবেগ নিয়ে কিছু কথা বললেন। আমি মাথা নাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করিনি। এমনকি তাঁকে একটা

প্রশ্নও করিনি। আমার যা জানার ছিল তা তো আগেই আন্টির কাছ থেকে জেনে নিয়েছি! তা ছাড়া কেন যেন মুখে কোনো প্রশ্নও আসছিল না। যাই হোক আমি প্রশ্ন না করাতে তিনি মনে কষ্ট পেলেন। তার ধারণা হলো যে তাঁকে আমার পছন্দ হয়নি। মন খারাপ হয়েছিল হয়তো।

দুপুরে বোনের বাসায় খেয়ে তাঁরা চলে গেলেন। বিকালে ভাইয়া আমাদের দুজনকেই ফোন করে জানতে চাইলেন কার কী মত। পরে জানালেন দুজনেরই নাকি একে অপরকে পছন্দ হয়েছে!

এপর্যন্ত সব ঠিকমতোই এগিয়েছে। এখন আসল পরীক্ষা শুরু। তা হলো আমার মাকে রাজি করানো! মাকে জানানোর দায়িত্ব ভাইয়া আর বোন নিল। টেনশনে আমার খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ। মুসলিম হওয়ার পর থেকে যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম সেই পরীক্ষার দিন এখন সামনেই।

ভাইয়া একদিন সন্ধ্যায় বোনের বাসায় মা আর বাবাকে দাওয়াত দিলেন। মা-বাবা যাওয়ার পর বোন আর ভাইয়া জানালেন প্রস্তাবের কথা। মা তো শুনেই না করে দিলেন। মুসলিম ছেলের সাথে তিনি কিছুতেই আমার বিয়ে দেবেন না। রাগ করেই বোনের বাসা থেকে চলে আসলেন মা।

এদিকে আমি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি। মা-বাবা যে রাজি হবেন না তা তো ভালোমতোই জানতাম। এখন বাসায় এসে আমাকে ইসলাম গ্রহণের কথা জিজ্ঞেস করলে কী বলব, কী করব এসব ভাবছিলাম। আর দুআ করছিলাম বার বার আল্লাহ যেন সব সহজ করে দেন। দুআ করতে লাগলাম বাবা-মা যেন রাজি হয়ে যান। তাদের না জানিয়ে বিয়ে করতে চাইনি কখনোই।

মা বাসায় আসার পর প্রথমে শান্ত ছিলেন। আমাকে ডেকে বললেন ভাইয়া আমার জন্য উনার মতো দাড়িওয়ালা মুসলিম ছেলে ঠিক করেছেন। আমিও কি দাড়িওয়ালা ছেলে বিয়ে করতে চাই? আমি মিনমিন করে বললাম, ভাইয়া যদি ঠিক করেন তবে ভালো ছেলেই হবে। তখন আর মায়ের বুঝতে বাকি থাকল না আমিও মুসলিম হয়ে গিয়েছি। এরপরের প্রতিক্রিয়া হলো ভয়ংকর। অনেক রাগারাগি করলেন, কান্নাকাটি করলেন, বারবার বোঝাতে লাগলেন। আমি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটা টুঁ শব্দও আর করিনি। এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলিনি। মায়ের কোনো প্রশ্নের জবাব

দিইনি। মাথা নিচু করে শুনে যাচ্ছিলাম সব। মা পাগলের মতো করছিলেন। একটু পর পর আমার রুমে এসে বকে যেতেন। একবার এসে মোবাইল নিয়ে গেলেন, হাতে যা টাকা ছিল নিয়ে গেলেন। পরে আবার এসে মোবাইল ফেরত দিয়ে গেলেন। ঘরের দরজা লাগাতে নিষেধ করে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে চোখ মুখ ফুলে গিয়েছিল মায়ের।

মা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গেলে আমি প্রথম কাঁদলাম। নিজের জন্য না, মায়ের জন্য। দুআ করলাম—আল্লাহ যেন মাকে হেদায়েত দেন, কষ্ট কমিয়ে দেন আর মাকে এই বিয়েতে রাজি করিয়ে দেন। আমি মাকে কষ্ট দিতে চাই না। কিন্তু আধুনিক, নামে মুসলিম; যারা মৌলিক ইসলাম পালন করে না, এদের কাউকে তো আর বিয়ে করতে পারি না।

ফেসবুকে ম্যাসেজ দিয়ে আন্টিকে সব জানিয়ে রাখলাম। সব শুনে আন্টি, প্রস্তাবদানকারী ভাই, তার মা, বোন সবাই আমার জন্য চিন্তা করতে লাগলেন। হবু শাশুড়ি তো আমাকে তখনই নিয়ে আসতে চাচ্ছিলেন। আমি নিষেধ করলাম। অপেক্ষা করতে চাইলাম কিছুদিন। মায়ের প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ ছিল, তবুও মনের কোথাও না কোথাও একটু আশা রয়ে গিয়েছিল। হয়তো মা রাজি হবেন, মেনে নেবেন সব। দুলাভাইও বললেন তাড়াহুড়ো না করতে।

মা বিয়ের জন্য রাজি না। বাসায় অনেক সমস্যা হচ্ছে। আমি খাওয়া-দাওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়েছি। বোনের বাসায় যেতে মা নিষেধ করে দিয়েছিল। ফোনে ওর সাথে যোগাযোগ ছিল। ও আমাকে সাহস দিত অনেক। আন্টিও যোগাযোগ রাখতেন।

এদিকে প্রস্তাবকারী ভাই জানালেন যেহেতু আমার মা রাজি না এবং রাজি হওয়ার সম্ভাবনা কম, তাই ওরা এক সপ্তাহ পর শুক্রবার বিয়ে সেরে ফেলতে চান। মাকে ছাড়া বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আর উপায়ও পাচ্ছিলাম না। তাই ভাবলাম এটাই বোধহয় ভালো হবে; রাজি হয়ে গেলাম। তবে ক্রমাগত দুআ করে যাচ্ছিলাম মা যেন রাজি হয়ে যায়।

এপ্রিলের ১ তারিখ, ২০১৩ হঠাৎ বোন ফোন করে জানাল বিয়ে হবে না। ওই ভাইটার মা হঠাৎ গররাজি। কোনো কথাই শুনতে চাচ্ছেন না। এক কথা, ছেলেকে আমার সাথে বিয়ে করতে দেবেন না। কেন এমন করছেন ছেলেটাও জানে না।

এবার আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। একদিকে বাসায় সবকিছু জেনে গেছে। চুপি চুপি আল্লাহর পথে যতটুকু চলতে পারছিলাম তার পথ পুরো বন্ধ। ওই দিনটা সলাত পড়তে পারিনি, ইসলামী বই পড়তে পারিনি; আবার কবে পারব জানি না। হতাশায় ডুবে থাকলাম একটা পুরো দিন। অন্যদিকে মা-ও ভয়াবহ কষ্ট পেলেন।

পরের দিন আমার অবস্থা দেখে মা-বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। কাঁদতে কাঁদতে আমার অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মা আমাকে ডেকে বললেন যে আমি চাইলে মুসলিম ছেলের সাথেই বিয়ে দিবেন। তবে দাড়ি ছাড়া একটু আধুনিক ছেলে হলে ভালো হয়। আমি কিছু বলিনি।

বড়মামি আসলেন বাসায়। জানতে চাইল আমি কি ওই ছেলেকেই বিয়ে করব? মা রাজি না হলেও কি ওকেই বিয়ে করব? হয়তো বোঝাতে চেয়েছিল বোনের মতো বাসা থেকে বেরিয়ে যাব কি না। আমি বললাম, আমি তো জানতাম মা রাজি হবেন না, তাও মাকে জানিয়েছি। মাকে ছাড়া আমি বিয়ে করতে চাই না। আমি চাইলে চলে যেতে পারতাম কিন্তু মা যাতে আমার বিয়েতে থাকেন এজন্যেই আমি মাকে জানিয়েছি। মামি যখন বুঝলেন আমি অন্য কোথাও বিয়ে করব না; তখন মামি আমার নানি আর বড়মামাকে বুঝিয়ে রাজি করালেন; কারণ, তারা রাজি থাকলে বাকি আত্মীয়রাও আর কিছু বলবে না।

এরপর থেকে মায়ের সামনেই অজু করতাম, যদিও ঘরে দরজা আটকে সলাত পড়তাম, মা বুঝতেন কিন্তু কিছুই বলতেন না। বাসাতেই ইসলামী বই পড়তাম। মায়ের সাথে বাইরে গেলে মাথায় কাপড় দিতাম না কিন্তু এমনিতে মাথায় কাপড় দিয়েই বাইরে যেতাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সব অনেক সহজ করে দিলেন। এভাবে হঠাৎ সব ঠিক হয়ে যাওয়া আল্লাহর দয়া ও রহমত ছাড়া আর কিছুই না। কল্পনাও করিনি এভাবে মা এগুলো সহ্য করবে! মা যে আমাকে এত ভালোবাসেন ও আমার কষ্ট সহ্য করতে পারবেন না তা আগে বুঝিনি। কিন্তু এটা ঠিক মা আমার ইসলাম পালনের ব্যাপারে সরাসরি কিছু না বললেও ভেতরে কষ্ট পাচ্ছেন খুব।

ওই ভাইয়ের তখন গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হয়েছে মাত্র; চাকরি খুঁজছে। চাকরি পেলেই আবার বাসায় আমাদের বিয়ের কথা তুলবে। বিয়েটা হবে এমন কোনো লক্ষণই ছিল না। তাও কেন যেন আমার মনে হচ্ছিল বিয়েটা হবে। দুজনই ইস্তেখারা পড়েছিলাম। দুজনই ধৈর্য ধরতে থাকলাম।

মধ্য থেকে লাভ হলো মা আমার মুসলিম হওয়ার ব্যাপারটা মেনে নিলেন। বোনের বাসায় যেতেও আর বাধা নেই। বিয়ে হওয়ার থাকলে হবেই ইন শা আল্লাহ। আমি সবর করতে লাগলাম আর নিজের ইসলামী জ্ঞান, ইসলাম পালন বৃদ্ধি করার দিকে মনোযোগ দিলাম। কোনোভাবেই মুমিন না হয়ে, পাপের বোঝা নিয়ে আমি আল্লাহর সামনে যেতে চাইনি। আমার সময়ের অবসরটা কাজে লাগাব ঠিক করলাম।

আমি দেখেছি যখনই আমি আল্লাহর পথে চলতে চেষ্টা করেছি। আল্লাহ কোনো না-কোনো ভাবে আমার জন্য সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। তেমনই কয়েকটা ছোট ছোট ঘটনা:

আমি বোনের বিয়ের পর ওর কাছ থেকে শিখে অনেকটা শুদ্ধ করে নিয়েছিলাম আমার সলাত। তবুও কিছু ছোট-খাট ব্যাপারে মাঝে মাঝে সন্দেহে ভুগতাম। টিউশনি ও পড়ার চাপে বোনের বাসায়ও আগের মতো যাওয়া হচ্ছিল না। এমন সময় বোনের থেকে জানলাম একটা জায়গায় এক আপু সলাতের ক্লাস নিচ্ছেন। তিন-চারটা ক্লাসে যাওয়ার সুযোগ পেলাম। আলহামদুলিল্লাহ, ওই কয়টা ক্লাস করেই অনেক কিছু শিখি। অনেক ভুল ঠিক করে নিতে পেরেছিলাম।

আমি বাংলা কুরআন পড়তাম, কিছু হাদীসের বই পড়তাম কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। মনে মনে ভাবছিলাম উনার জীবন নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। এমনি সময় একদিন আমার চাচাতো বোন ফোন করে বলে আমাকে প্রস্তাবকারী ভাই নাকি আমার জন্য একটা বই পাঠিয়েছে—*আর রাহীকুল মাখতুম*। আলহামদুলিল্লাহ বইটা এত ভালো যে যতই পড়ি মন ভরে না।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম প্রচার শুরু করার অংশে আসার পর আর পড়তে পারতাম না। মনে হতো আরও পড়লেই তো রসূলের মৃত্যুর কথা পড়তে হবে। তাঁর মারা যাওয়ার কথা ভাবতেও কষ্টে বুক ভেঙে আসছিল। অনেকদিন পড়া বন্ধ রেখেছিলাম।

শীতের দিন মেঝেতে সলাত পড়তে কষ্ট হচ্ছিল। হাতে তেমন টাকা ছিল না। ভাবছিলাম কিছু টাকা জমিয়ে একটা জায়নামায কিনব। কিন্তু আর কিছুদিনের মাঝেই আমার ভার্সিটির এক ফ্রেন্ড আমাকে সুন্দর একটা জায়নামায উপহার দেয়। আলহামদুলিল্লাহ!

রমাদান মাস সম্পর্কে, এই মাসের ইবাদাত, বিদআত ইত্যাদি সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ছিল। একদিন বোনের বাসায় যাওয়ার পরে ও আমাকে একটা বই দিল যেটাতে রমাদান সম্পর্কিত হাদীসসহ বিস্তারিত বর্ণনা ছিল। আলহামদুলিল্লাহ!

মাযহাব সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা ছিল না। একদিন ক্লাসে একজন প্রশ্ন করল আমি কোন মাযহাব পালন করি, একটা না-একটা মাযহাব নাকি পালন করতেই হয়। সেদিনই দুলাভাইদের বাসায় প্রতি বৃহস্পতিবার যে তাফসীর অনুষ্ঠান হয় সেখানে গেলাম। একজন দ্বীনি বোন বিক্রি করার জন্য কিছু বই এনেছিলেন। সেখান থেকে চারজন ইমামের জীবনমূলক একটা বই পেলাম। সাথে সাথে বইটা কিনে নিয়েছিলাম।

রমাদান মাসে আমি আরবী পড়া শিখব নিয়ত করেছিলাম। কিন্তু আমার তো কোনো শিক্ষিকা নেই। একদিন অ্যান্ড্রয়েডের প্লে-স্টোরে একটা খুব ভালো অ্যাপ পাই যার সাহায্যে আরবী পড়া শিখে যাই একা একা। উচ্চারণ শতভাগ ঠিক হয়তো হয়নি কিন্তু পড়তে তো শিখে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ!

আরবী পড়া শিখলাম কিন্তু বাসায় আরবী কুরআন নেই। একটা কিনব ভাবছি, এমন সময় আরেকজন বাংলা অর্থসহ একটা আরবী কুরআন উপহার দিয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ!

এভাবে আল্লাহর সাহায্য আসতেই লাগল। মন খারাপ থাকলে দেখতাম কেউ না-কেউ ওই বিষয় নিয়েই ফেসবুকে পোস্ট করেছে। কোনো বিষয়ে সমস্যা থাকলে ওটা নিয়েই কোনো না-কোনো হাদীস বা লেখা পেয়ে যেতাম ইন্টারনেটে বসলে।

সবচেয়ে বড় যে সাহায্য আল্লাহ আমাকে করতেন—তিনি আমাকে অনেক গুনাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। যেমন কোনো এক জায়গায় গেলে হয়তো গুনাহ হবে, দেখা যেত ওইদিনই আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি বা কোনো বাধা এসে উপস্থিত। আলহামদুলিল্লাহ!

প্রতিটা পদে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করতেন। এখনও করেন। আল্লাহর পথে আসার পর থেকে কখনো আর নিজেকে একা মনে হয়নি। ঈমানের স্বাদ পাওয়ার পর থেকে অনেকদিনের দুশ্চিন্তা, ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। মা আর সলাত পড়তে বাধা দেন না। আত্মীয়রা অনেকেই অনেক কথা শোনায় মা-কে কিন্তু আমার সেসব কথা গায়ে লাগত না। আমার মামি খ্রিস্টান হয়েও আমাকে অনেক সমর্থন দেন।

আমি ভালোই ছিলাম কিন্তু মাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। বাইরের অনেকে বলত, আহারে! তোমার জন্য কষ্ট হয়, তোমার দুই মেয়েই তোমার ধর্ম ছেড়ে চলে গেল। মেয়েদের জন্য এতকিছু করলে কিন্তু ওরা কেউ তোমার থাকল না। এমন অনেক কথা মাকে সহ্য করতে হতো। মা বাসায় এসে কাঁদতেন, মন খারাপ করে থাকতেন। কিন্তু আমাকে জোর করতেন না ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিতে। মাঝে মাঝে আমাকে অল্পতেই বকতেন। আবার আমার বিয়ে হবে, চলে যাব ভেবেও কাঁদতেন। খুব কষ্ট হতো মায়ের জন্য; কিন্তু দুআ করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না আমার।

আমাকে প্রস্তাবকারী ভাইটা ইতিমধ্যে আবার তার পরিবারকে রাজি করায় বিয়ের জন্য। ঠিক হলো ওরা জুন মাসের এক শনিবার বিয়ের কথা বলতে বাসায় আসবে। ওরা যেদিন আসবে তার আগেরদিন আইসিডি নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে বিয়ের ওপর দিনব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। আমরা দুজনই সেখানে যাই। সেখানে পাত্রপাত্রী বাছাই, দেখাদেখি, আকদ, ওয়ালীমা, তালাক ইত্যাদি বিয়ে সম্পর্কিত সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের বিয়েটা কীভাবে করতে হবে, কী কী করা যাবে না অনেক কিছুই আমরা শিখতে পারি। পরেরদিন বিকালে আমার বাসায় ও, ওর মা, বোন আর ভাবীকে নিয়ে আসে আমাকে দেখতে। বোন দুলাভাইও এলেন। ঠিক হলো ও চাকরি পেলে সেপ্টেম্বরে বিয়ে হবে।

খুব সুন্দর একটা বিকেল কাটিয়ে সব মেহমানেরা বাসায় চলে গেলেন। বাবা-মা সবাই খুশি। পরেরদিন বোন ফোন করে জানাল ছেলের মা নাকি বিয়েতে রাজি না। ছেলে এখন না পারছে ওর মাকে কষ্ট দিতে, না পারছে আমাকে মানা করে দিতে। আরো সময় দরকার। কথাটা শুনে আমার কেমন লাগল বোঝাতে পারব না। কোনো অনুভূতিই কাজ করছিল না। সিদ্ধান্ত নিলাম সময় যখন চেয়েছে অপেক্ষা করব। মা-বাবা কিছু বললেন না। তারাও বুঝতে পেরেছিল আমি কষ্ট পাচ্ছি। দুই দুইবার এমন হলো। সবর করতে লাগলাম।

জুন মাসের মাঝামাঝিতে একদিন হঠাৎ দুলাভাই বিকালে ফোন করে জানালেন আমাকে উনার বাসায় যেতে। ছেলে আর ছেলের মা আসবেন। তার মা আমার সাথে কথা বলতে চান। ছেলের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। ফলে কেন এসেছেন, রাজি হয়েছেন কিনা—কিছুই জানি না।

বাবার সাথে সন্ধ্যার দিকে গেলাম বোনের বাসায়। ছেলের মা তাদের বাসার অবস্থা বললেন। দুলাভাইয়ের মা-ও তাকে আমার সম্পর্কে ধারণা দিলেন। তার মা আমাকে প্রশ্ন করলেন সব জেনেশুনে বিয়েতে রাজি কি না। জানালাম, রাজি। তখন তিনি ছেলেকে ডাক দিয়ে বললেন, চল বউমাকে বাসায় নিয়ে যাই। আমরা তো অবাক! এটা কী হলো! যিনি বিয়েতে একদমই রাজি ছিলেন না তিনিই পারলে আমাকে এখনই বিয়ে করিয়ে বাসায় নিয়ে যান! আর ওই মাসেই ছেলে গাজীপুরে চাকরি পেয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ! সবর করার ও আল্লাহর প্রতি ভরসা করার ফল হাতে নাতে পেলাম।

ঈদের পরদিন আমাদের বিয়ে হয়। আমাদের বিয়েতে ৩৫, ০০০ টাকার মতো খরচ হয়েছিল সর্বমোট। আমার মা-বাবা বিয়েতে তেমন টাকা খরচ করেননি। আইসিডি কর্তৃপক্ষ সেখানে আমাদের বিয়ের অনুমতি দেন। প্রায় ষাটজন মানুষের খাবার আয়োজন করা হয়েছিল। ছেলে-মেয়েরা যেন সম্পূর্ণ আলাদা থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মেয়েদের ওখানে মেয়েরাই খাবার সার্ভ করেছিল। বিয়ের খাবার যা বেঁচে গিয়েছিল তা একটা মাদ্রাসায় দিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি উচ্ছিষ্ট হাড়, খাবার ডাস্টবিনে না ফেলে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানো হয়েছিল। বিয়ের মোহর

ছিল ৫০০০০ টাকা ও সূরাহ আল-মূল্‌ক।টাকা বিয়ের আগেই আমার কাছে দেওয়া হয় আর সূরাহটা আমার স্বামী বিয়ের রাতে আমাকে তেলাওয়াত করে শোনায়।[২৯]

সেদিন সকাল থেকে অনেক বৃষ্টি হচ্ছিল। খুব সুন্দর একটা দিন। সবচেয়ে বড় কথা আমার বিয়েতে আমার মা উপস্থিত ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ। শুধু তা-ই না আমার খ্রিষ্টান আত্মীয়দের কেউ কেউ ছিলেন। আল্লাহ আমার দুআ কবুল করে নিয়েছিলেন। সবাই বিয়ের দিন কাঁদে, কিন্তু আল্লাহ আমার ইচ্ছা এভাবে পূরণ করায় আমি এত খুশি ছিলাম যে সারাক্ষণ আমার মুখে হাসি ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে যতোই ধন্যবাদ দিই না কেন, কোনোদিন আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করতে পারব না। আমার বিয়ের পেছনে, অনুষ্ঠানটা সুন্দর করার পিছে দুলাভাই আর বোনের অবদান অনেক বেশি ছিল। ওরা প্রতিটা ব্যাপারে খেয়াল রেখেছিলেন যাতে বিয়েটা সুন্দরভাবে ও ইসলামী শারীয়া অনুযায়ী হয়।

বিয়ের পর ইসলাম পালনে আমার আর সমস্যা হয়নি আলহামদুলিল্লাহ। আমার শাশুড়ি সবাইকে বলতেন, আমি বউ না, মেয়ে এনেছি বাসায়। মা বলে ডাকেন আমাকে। আমার মা যিনি দাড়িওয়ালা মুসলিম ছেলে পছন্দ করতেন না, আমাকে এখন সব সময় বলেন, ও অনেক ভালো ছেলে, ওর বা ওর পরিবারের কারও মনে কষ্ট দিয়ো না। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর এত রহমত, এত বরকত আমি পেয়েছি যে সেটা বলে শেষ করা যাবে না।

আমি এখন গর্ব করে বলতে পারি আমি একজন মুসলিমা। ইসলামের পথে আসাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। আল্লাহ তার বান্দাদের কখনো নিরাশ করেন না। আল্লাহর পথে চলতে গেলে বাধা, কষ্ট আসবেই। কিন্তু আল্লাহর ওপর ভরসা করে সবর করলে এর ফল অনেক বেশি মধুর হয়। আল্লাহু আকবার!

---

২৯ কোনো কোনো আলিমের মতে যাদের অর্থ-সম্পদ দিয়ে মোহর দেওয়ার সামর্থ্য আছে তাদের জন্য কুরআন মুখস্থ করাকে মোহর হিসেবে ধার্য করা সুন্নাহ নয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সাহাবার ক্ষেত্রে কুরআন মোহর ধার্য করেছিলেন যার সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। আর মোহর বিয়ের আগে না করে বিয়ের পরে মেয়েকে প্রদান করতে হয়। - সম্পাদক।

সিহিন্তার শেষ কথা

মুসলিম হওয়ার সাত বছর পরে এ লেখাটা লেখা। এখন তিনজন সন্তান নিয়ে আমার সংসার। সুখী? আলহামদুলিল্লাহ। আমার বোন-ও ভালো আছে। বাবা এখন অনেকটাই বদলে গেছেন, ফিরে এসেছেন ইসলামের পথে। মা-ও যেন ফিরে আসেন সেই দুআ করি আমি আর আমার ছেলেরা।

আমি বহুবার আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলতে চেয়েছি আমি কীভাবে ইসলামে এলাম। বলতে চেয়েছি তোমরা জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করো, আসল প্রভু কে তা নিয়ে ভাবো। যখনই চিন্তা করি আমাকে ছোট থেকে বড় করলেন যারা, ছোট থেকে বড় হলাম যে ভাই-বোনগুলোর সাথে; তারা অনন্তকাল আগুনে পুড়বে আল্লাহর স্থানে যিশুকে বসানোর কারণে, তখনই খুব কষ্ট লাগে। অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু বলতে পারিনি।

এই লেখাটা শুধু আমার বদলে যাওয়ার গল্প নয়, যিশুকে যারা ভালোবাসে তাদের সবার কাছে আমার একটা বার্তা: যিশু ক্রুশে মারা যাননি। তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। তিনি পৃথিবীতে যে ধর্মের হয়ে লড়াই করবেন তোমরা সেই ধর্মে ফিরে আসো। যিশু যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন তোমরা সে ধর্মে ফিরে আসো।

মুসলিম নামধারী মানুষদেরও কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করে। আল্লাহ মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা একদিক থেকে দেখলে যেমন আশীর্বাদ অন্যদিক থেকে দেখলে পরীক্ষা। আমি অনেক খুঁজে ফিরে ইসলাম পেয়েছি। যারা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করে সহজেই ইসলাম পেয়েছেন, তারপরেও ইসলাম সম্পর্কে জানেন না, জানার চেষ্টা করেন না, ইসলাম মানেন না—তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কী জবাব দেবেন?

সিহিন্তা শরীফাঃ

সম্পাদিকা, মা, এবং গৃহিণী। তিন সন্তান। ভবিষ্যতে সন্তানদের আলোকিত মানুষ, সত্য পথের যোদ্ধা হিসেবে তৈরী করবেন—এই স্বপ্ন তাঁর।

এ বিশাল ডামাডোলের মাঝে ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলরস অফ এডুকেশনে পড়ার চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন বটে।

নাইলাহ আমাতুল্লাহঃ

লেখিকা, মা, গৃহিণী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। পড়াশোনা করেছেন প্রাণরসায়নে। এফ-কমার্স পেইজ হ্যাপি হোমসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

সত্য পথের সন্ধানটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। সন্তানদের সত্য পথের আহবায়ক হিসেবে গড়ে তুলবেন—এটা তাঁর সবচেয়ে বড় চাওয়া।

যাযাবরদের ক্যারাভান এটা। ঘুরে বেড়ায় এখানে-ওখানে। কোনো গন্তব্য নেই। মেয়ে দুটো বড় হয়েছে যাযাবরদের এই তাঁবুতেই। একটা মেয়ে একটু ভাবুক। সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রায়ই ভাবে—কোথায় যাচ্ছি?

একদিন দলপতিদের কাছে গিয়ে বলল সে, ভুল পথে চলেছি আমরা।

- প্রমাণ?

- ওই যে সূর্যটা দেখুন। আর ওই যে তারাগুলো। ওই পথটা সঠিক পথ।

- উহু, এটাই ঠিক পথ। এ পথেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা ঘুরে বেড়াতেন।

মেয়েটা উদভ্রান্তের মতো ঘুরল আরও কয়েকদিন ক্যারাভানটার সাথে।

বুঝল এই যাত্রার পরিণাম ভয়াবহ। এ পথে চলা হবে এমন এক ভুল যা শোধরানো যাবে না।

সে জানে তার একটা নীড় আছে—কোথায় সে নীড়?

সেই নীড়ে ফেরার একটা পথ আছে। কোন সে পথ?

বিশাল দিগন্তে অভিযাত্রী দুই বোন। সংগ্রামমুখর এক পর্যটন।

কীভাবে ফিরেছিল তারা নীড়ে?

ফেরার পরিক্রমায় স্বাগতম।

ISBN
9 789849 222316